ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ

ফিকহ ৫ম পত্র: দিরাসাতুল ফাতাওয়া (পত্র কোড-৬৩১১০৫)

ক বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্ন

আল ফাতাওয়াস সিরাজিয়াহ

جنازة : জানাযা

প্রশ্ন-১৪: [সিরাজিয়াহ-এর জানাযা অধ্যায়ে বর্ণিত মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো এবং তার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত আহকাম বা বিধানগুলো কী কী?] [ما هي الأحكام المتعلقة بغسل الميت وكيفيته، كما وردت في باب الجنائز من السراجية؟]

প্রশ্ন-১৫: [হানাফী ফিকহে জানাযার নামাযের শর্তাবলি ও রুকন (ফরজ) কী কী? সিরাজিয়াহ-এর লেখক এ বিষয়ে কী কী বক্তব্য উল্লেখ করেছেন?] [ما هي شروط صلاة الجنازة وأركانها في الفقه الحنفي؟ وما هي الأقوال التي أوردها صاحب السراجية في ذلك؟]

প্রশ্ন-১৬: [হানাফী ফিকহে শহীদ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিধান কী? জানাযার ক্ষেত্রে সাধারণ মৃত ব্যক্তির চেয়ে শহীদের বিধান কীভাবে আলাদা?] [ما هي الأحكام الخاصة بالشهيد في الفقه الحنفي؟ وكيف تميزت أحكامه عن الميت العادي في الجنائز؟]

الأيمان : কসম/শপথ

প্রশ্ন-১৭: [হানাফী ফিকহে 'কসম/শপথ' (আল-ঈমান) অধ্যায়ের পরিচয় দাও। সিরাজুদ্দীন কসমের যে প্রকারভেদ ও বিভাগগুলো উল্লেখ করেছেন তা কী কী?] [عرف باب "الأيمان" في الفقه الحنفي - وما هي أنواع اليمين وأقسامها كما أوردها سراج الدين؟]

প্রশ্ন-১৮: [কসম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী এবং কখন কসম কার্যকর হয় এবং হানাফীদের মতে কখন কাফফারা ওয়াজিব হয়?] [ما هي شروط صحة اليمين ومتى تنعقد اليمين وتؤدي إلى وجوب الكفارة عند الحنفية؟]

প্রশ্ন-১৯: ['আল-ইয়ামিনুল গামুস' (মিথ্যা কসম) এবং 'আল-ইয়ামিনুল লাগব' (অসার কসম)-এর মাসয়ালা এবং কাফফারা সম্পর্কিত বিধানগুলো গ্রন্থে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।] [اشرح مسألة "اليمين الغموس" و "اليمين اللغو" وأحكامهما المتعلقة بالكفارة في الكتاب.]

প্রশ্ন-২০: [কোনো শর্তের সাথে যুক্ত কসমের ক্ষেত্রে 'শপথ ভঙ্গ' (আল-হিনস) কীভাবে বাস্তবায়িত হয়? এবং সে ধরনের কিছু কসমের উদাহরণ কী কী?] [كيف يتحقق الحنث (الحلف) في اليمين المعلقة على شرط؟ وما هي بعض صور اليمين المعلقة المذكورة؟]

الحدود : শাস্তি/হদ

প্রশ্ন-২১: [ইসলামী ফিকহে 'হদ' (শাস্তি)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী হুদুদ (শাস্তি)-এর বিধান দেওয়ার মূল লক্ষ্যগুলো কী?] [عرف "الحد" في الفقه الإسلامي - وما هي أهداف شرعية الحدود كما يشير إليها الفقه الحنفي؟]

প্রশ্ন-২২: [যিনার (অবৈধ যৌনতা) হদ (শাস্তি) কার্যকর করার শর্তাবলি কী কী? এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এর প্রমাণের দলিলগুলো কী?] [ما هي شروط إقامة حد الزنا؟ وما هي أدلة ثبوته في القضاء الإسلامي؟]

প্রশ্ন-২৩: [অপবাদের হদ (হদ্দুল কাজফ) সম্পর্কে আলোচনা কর। এটি ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী এবং কীভাবে এ শাস্তি বাতিল হতে পারে?] [تحدث عن حد القذف (قذف المحصن)، وما هي شروط وجوبه وكيف يسقط هذا الحد؟]

السرقة : (চুরি) - নির্ধারিত পাঠ

প্রশ্ন-২৪: [হানাফী ফিকহে যে চুরির জন্য হাত কাটা ওয়াজিব হয়, তার সংজ্ঞা দাও। চুরি হওয়া বস্তুর মধ্যে কোন্ শর্তগুলো থাকা আবশ্যক?] [عرف "السرقة" التي توجب القطع في الفقه الحنفي - وما هي الشروط التي يجب توافرها في المال المسروق؟]

প্রশ্ন-২৫: [চুরির হদ (শাস্তি) কার্যকরের জন্য গ্রহণযোগ্য 'নিসাব' (নির্দিষ্ট পরিমাণ) কী? এবং বিচার ব্যবস্থায় চুরি কীভাবে প্রমাণিত হয়?] [ما هو "النصاب" المعتبر لإقامة حد السرقة؟ وكيف يتم إثبات السرقة في القضاء؟]

প্রশ্ন-২৬: [নিকটাত্মীয় বা মূল ব্যক্তির (পিতা-মাতা) ঘরে চুরির বিধান ব্যাখ্যা কর। সর্বাবস্থায় কি চোরের হাত কাটা হবে?] [اشرح أحكام السرقة في بيت القريب أو الأصل - وهل يقطع السارق في كل الأحوال؟]

الكراهية والاستحسان : মাকরূহ ও ইসতিহসান

প্রশ্ন-২৭: [হানাফী ফিকহে মাকরূহ এর প্রকারভেদ (তাহরীমি ও তানযিহি)-এর সংজ্ঞা দাও। সিরাজিয়াহ থেকে প্রতিটি প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।] [عرف أقسام]

الكراهة (التحريمية والتنزيهية) في الفقه الحنفي - واذكر مثالا لكل قسم من السراجية.]

প্রশ্ন-২৮: [যে সকল মাসয়ালায় মাকরূহ-এর বিধান আসে, সেখানে ফয়সালার মূলনীতি কী? এবং ফকীহ কীভাবে মাকরূহ ও জায়েযের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন?] [ما هي العدة في المسائل التي ترد فيها الكراهة؟ وكيف يوازن الفقيه بين المكروه والجائز؟]

প্রশ্ন-২৯: [হানাফীদের মতে 'ইসতিহসান' (পছন্দনীয় মত)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এবং তা বৈধ হওয়ার দলিল কী?] [عرف "الاستحسان" لغة واصطلاحا عند الحنفية - وما هو دليل حجيته؟]

প্রশ্ন-৩০: [ফিকহী বিধানে 'মাকরূহ' এবং 'ইসতিহসান'-এর মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং কোনো কোনো বিধানে কি এদুটি পরস্পর একে অপরের বিপরীত হতে পারে?] [ما هي العلاقة بين "الكراهة" و "الاستحسان" في التشريع الفقهي؟ وهل يتعارضان في بعض الأحكام؟]

اللقيط واللقطة : পরিত্যক্ত শিশু ও পড়ে থাকা বস্তু

প্রশ্ন-৩১: [ফিকহে 'পরিত্যক্ত শিশু' (আল-লাক্বীত)-এর সংজ্ঞা দাও। গ্রন্থে বর্ণিত তার ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব এবং বংশগত বিধান কী?] [عرف "اللقيط" في الفقه - وما هي أحكام نفقته وولايته ونسبه كما جاء في الكتاب؟]

প্রশ্ন-৩২: [পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার বিধান দেওয়ার পেছনে শরীয়তের রহস্য কী? হানাফীদের মতে এটি কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম কী?] [ما هي الحكمة من مشروعية التقاط اللقيط؟ وما هو حكم التقاطه عند الحنفية؟]

প্রশ্ন-৩৩: [হানাফী ফিকহে পড়ে থাকা বস্তুর ঘোষণার পদ্ধতি এবং এর সময়কাল ব্যাখ্যা কর। কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি কখন এর মালিক হতে পারে?] [اشرح كيفية تعريف اللقطة ومدته في الفقه الحنفي - ومتى يمتلك الملتقط اللقطة؟]

الصيد والذبائح : শিকার ও জবাইকৃত প্রাণী

প্রশ্ন-৩৪: [যে শিকারের গোশত খাওয়া জায়েয, তার সংজ্ঞা দাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী (কুকুর ও পাখি) দ্বারা শিকার করার শুদ্ধতার শর্তাবলি কী কী?] [عرف "الصيد" الذي يباح أكله - وما هي شروط صحة الصيد بالجوارح المدربة (الكلب والطائر)؟]

প্রশ্ন-৩৫: [জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য জবাইকারী (যাবেহ) এবং যবাইয়ের যন্ত্রের মধ্যে কোন্ শর্তগুলো থাকা আবশ্যক? ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম

কী?] [ما هي الشروط التي يجب توافرها في "الذابح" و "الآلة" حتى تصح الذبيحة؟ وما هو حكم ترك التسمية عمدا أو نسيانا؟]

প্রশ্ন-৩৬: [হারাম (পবিত্র এলাকা)-এর শিকার এবং ইহরামকারী ব্যক্তির শিকারের হুকুম কী? 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ পাখির শিকার সম্পর্কিত বিধান কী?] [ما هو حكم صيد الحرم وصيد المحرم؟ وما هي الأحكام المتعلقة بصيد الطير في الفتاوى السراجية؟]

الأضاحي : কুরবানী

প্রশ্ন-৩৭: [শরীয়তের পরিভাষায় 'কুরবানী' (আল-উদ্বহিয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী মাযহাবে এর হুকুম কী এবং এর দলিল কী?] [عرف "الأضحية" شرعا - وما حكمها في المذهب الحنفي ودليله؟]

প্রশ্ন-৩৮: [মুসলমানের উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী কী? এবং কুরবানী করার নির্ধারিত সময়কাল কী?] [ما هي شروط وجوب الأضحية على المسلم؟ وما هي الأوقات المحددة لأدائها؟]

প্রশ্ন-৩৯: [হানাফী মাযহাবে কুরবানীতে অংশগ্রহণের (শরীক হওয়ার) বিধান ব্যাখ্যা কর। গরু ও উটে অংশগ্রহণের সীমা কতটুকু?] [اشرح أحكام الاشتراك في الأضحية - وما هو حدود المشاركة في البقر والإبل في المذهب الحنفي؟]

প্রশ্ন-৪০: [পশুর মধ্যে এমন কী কী দোষ থাকলে তার দ্বারা কুরবানী করা নিষেধ? কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর দোষ প্রকাশ পেলে এর বিধান কী?] [ما هي العيوب التي تمنع من التضحية بالحيوان؟ وما هي الأحكام المتعلقة بالأضحية إذا ظهر العيب بعد التعيين؟]

القضاء : বিচারব্যবস্থা

প্রশ্ন-৪১: [শরীয়তের পরিভাষায় 'বিচারব্যবস্থা' (আল-ক্বাযা)-এর সংজ্ঞা দাও। ইসলামে বিচার ব্যবস্থার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?] [عرف "القضاء" شرعا - وما هي الحكمة من مشروعية القضاء في الإسلام؟]

প্রশ্ন-৪২: [হানাফীদের মতে বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার শর্তাবলি কী কী? বিচারকের জন্য মুজতাহিদ হওয়া কি শর্ত?] [ما هي شروط تولية القاضي عند الحنفية؟ وهل يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا؟]

প্রশ্ন-৪৩: [হানাফী ফিকহে বিচারিক ফয়সালার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিগুলো কী কী (যেমন: স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ)? এবং সেগুলোর তদন্ত কীভাবে করা হয়?] [ما هي طرق الحكم القضائي المعتمدة في الفقه الحنفي (كالإقرار والبينة)؟ وكيف يتم التحقيق فيها؟]

প্রশ্ন-৪৪: [বিচারককে পদচ্যুত করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা কর। কোন্ কোন্ কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়?] [تحدث عن حكم عزل القاضي - وما هي الأسباب التي توجب عزله عن منصبه؟]

الدعوى : মামলা

প্রশ্ন-৪৫: [শরীয়তের পরিভাষায় 'মামলা/দাবী' (আল-দাওয়া)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী মাযহাবে বিচারক কর্তৃক বিচার করার জন্য মামলার শুদ্ধতার শর্তাবলি কী কী?] [عرف "الدعوى" شرعا - وما هي شروط صحة الدعوى لينظر فيها القاضي في المذهب الحنفي؟]

প্রশ্ন-৪৬: [মামলা দায়ের ও শুনানির পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। বাদী (মুদ্দাঈ) এবং বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?] [اشرح طريقة تقديم الدعوى وسماعها - وما هو الفرق بين المدعي والمدعى عليه؟]

প্রশ্ন-৪৭: [হানাফী ফিকহে মামলা প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) কী? এবং মামলাসমূহে কসমের ভূমিকা কী?] [ما هي البينة (الدليل) المعتبرة لإثبات الدعوى في الفقه الحنفي؟ وما هو دور الأيمان في الدعاوى؟]

الإقرار والوكالة : স্বীকারোক্তি ও ওকালতি

প্রশ্ন-৪৮: [শরীয়তের পরিভাষায় 'স্বীকারোক্তি' (আল-ইক্বার)-এর সংজ্ঞা দাও। স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী কী, যাতে এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেওয়া যায়?] [عرف "الإقرار" شرعا - وما هي شروط صحة الإقرار حتى يترتب عليه الحكم؟]

প্রশ্ন-৪৯: [আল্লাহর হক্ক এবং বান্দার হক্ক (অধিকার) সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির হুকুম কী? স্বীকারকারী কি তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসতে পারে?] [ما هو حكم الإقرار بحقوق الله وحقوق العباد؟ وهل يرجع المقر عن إقراره؟]

প্রশ্ন-৫০: [ফিকহে 'ওকালতি/প্রতিনিধিত্ব' (আল-ওয়াকালা)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফীদের মতে ওকালতি শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক রুকনগুলো কী কী?] [عرف "الوكالة" في الفقه - وما هي الأركان الأساسية لصحة عقد الوكالة عند الحنفية؟]

প্রশ্ন-৫১: [মুয়াক্কিল (যার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা হলো)-এর অধিকারের ক্ষেত্রে উকিলের আচরণের বিধান ব্যাখ্যা কর। উকিলের হাতে যা নষ্ট হয়, তার জন্য কি তিনি দায়ী থাকবেন?] [اشرح أحكام تصرف الوكيل في حقوق الموكل - وهل يضمن الوكيل ما يتلف في يده؟]

القصاص : প্রতিশোধ/কিসাস

প্রশ্ন-৫২: [শরীয়তের পরিভাষায় 'কিসাস' (প্রতিশোধ)-এর সংজ্ঞা দাও। ইসলামে কিসাসের বিধান দেওয়ার পেছনের উদ্দেশ্য কী?] [عرف "القصاص" شرعا - وما هي الحكمة من مشروعية القصاص في الإسلام؟]

প্রশ্ন-৫৩: [প্রাণের ক্ষতি ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতির ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান ব্যাখ্যা কর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলি কী কী?] [اشرح أحكام القصاص فيما دون النفس (في الأعضاء) - وما هي شروط إجراء القصاص في الأعضاء؟]

প্রশ্ন-৫৪: [কিসাস থেকে 'ক্ষমা' (আল-আফউ)-এর মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা কর। রায় দেওয়ার আগে ও পরে ক্ষমা করে দেওয়ার হুকুম কী?] [تحدث عن مسألة "العفو عن القصاص - وما هو حكم العفو بعد الحكم وقبله؟]

الفرائض : ফারাইয/উত্তরাধিকার

প্রশ্ন-৫৫: [শরীয়তের পরিভাষায় 'ফারাইয' (উত্তরাধিকার) এবং 'মিরাস'-এর সংজ্ঞা দাও। মিরাসের রুকন (মৌলিক উপাদান) ও শর্তাবলি কী কী?] [عرف "الفرائض" و "الإرث" شرعا - وما هي أركان الإرث وشروطه؟]

প্রশ্ন-৫৬: ['আসহাবুল ফুরূয' (নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী) কারা? হানাফী ফিকহে তাদের নির্ধারিত অংশগুলো কী কী?] [من هم "أصحاب الفروض"؟ وما هي أقسامهم وأنصبتهم المقررة في الفقه الحنفي؟]

প্রশ্ন-৫৭: ['যাবিল আরহাম' (রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়)-সম্পর্কে আলোচনা কর। হানাফী মাযহাবে তাদের উত্তরাধিকারের হুকুম কী এবং একজনকে উপর আরেকজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পদ্ধতি কী?] [تحدث عن "ذوي الأرحام" - وما هو حكم إرثهم وتقديم بعضهم على بعض في المذهب الحنفي؟]

الخنثى : উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি

প্রশ্ন-৫৮: ইসলামী ফিকহে 'উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি' (আল-খুনসা)-এর সংজ্ঞা দাও। 'আল-খুনসা আল-মুশকিল' (অস্পষ্ট) এবং 'গাইরু আল-মুশকিল' (অস্পষ্টহীন)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?] [عرف "الخنثى" في الفقه الإسلامي - وما هو الفرق بين "الخنثى المشكل" و "غير المشكل"؟]

প্রশ্ন-৫৯: [অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কোন কোন চিহ্ন বা আলামতের উপর নির্ভর করা হয়? এবং কখন তাকে পুরুষ বা নারী হিসেবে গণ্য করা হয়?] [ما هي العلامات التي يعتمد عليها لتحديد جنس الخنثى المشكل؟ ومتى يتم اعتباره ذكرا أو أنثى؟]

প্রশ্ন-৬০: [হানাফী ফিকহে 'উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি'-এর পবিত্রতা ও নামায সম্পর্কিত বিধানাবলী ব্যাখ্যা কর।] [اشرح أحكام "الخنثى" المتعلقة بالطهارة والصلاة في الفقه الحنفي.]

الحيل والمخارج : কৌশল ও শরয়ী সমাধান

প্রশ্ন-৬১: [হানাফী ফিকহে 'শরীয়তসম্মত কৌশল' (আল-হিয়াল আল-শারইয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। জায়েয এবং নিষিদ্ধ কৌশলের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড কী?] [عرف "الحيل الشرعية" في الفقه الحنفي - وما هو ضابط التفرقة بين الحيلة الجائزة والممنوعة؟]

প্রশ্ন-৬২: [শরীয়তসম্মত কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হয় (যেমন জটিলতা থেকে মুক্তির উপায়)?] [ما هي الأهداف التي يراد تحقيقها من وراء استخدام الحيل الشرعية (كمخرج من الحرج)؟]

প্রশ্ন-৬৩: ['আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থ থেকে কসম বা লেনদেন অধ্যায়ের একটি জায়েয কৌশলের উদাহরণ ব্যাখ্যা কর।] [اشرح مثالا لحيلة جائزة في باب الأيمان أو باب البيوع من كتاب الفتاوى السراجية.]

آداب المفتي والتنبيه على الجواب
মুফতির আদব ও ফাতাওয়ার উত্তরের প্রতি মনোযোগ

প্রশ্ন-৬৪: ['মুফতি' (ফাতওয়া প্রদানকারী) কে? হানাফী মাযহাবে ফাতওয়া প্রদানের জন্য তাঁর মধ্যে কোন কোন যোগ্যতা ও শর্তাবলি থাকা আবশ্যক?] [من هو "المفتي"؟ وما هي شروط أهلية الإفتاء التي يجب توافرها فيه في المذهب الحنفي؟]

প্রশ্ন-৬৫: [ফাতওয়া প্রদানের সময় এবং ফাতওয়ার মজলিসে বসার ক্ষেত্রে মুফতির উপর ওয়াজিব কিছু আদব (যেমন: ইখলাস ও ধীরস্থিরতা) ব্যাখ্যা কর।] [اشرح بعض الآداب الواجبة على المفتي في حال الإفتاء والجلوس للفتوى (كالإخلاص والتأني).]

প্রশ্ন-৬৬: [ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য নন এমন ব্যক্তির ফাতওয়া দেওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা কর। জ্ঞান ছাড়া ফাতওয়া দেওয়ার খারাপ পরিণতিগুলো কী কী?] [تحدث عن حكم الإفتاء لمن ليس أهلا للفتوى - وما هي الآثار السيئة المترتبة على الإفتاء بغير علم؟]

প্রশ্ন-৬৭: [কোনো মাসয়ালায় ফিকহী মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে মুফতি কীভাবে আচরণ করবেন? উত্তরে কি তাঁর জন্য ইমামগণের বিভিন্ন মত উল্লেখ করা আবশ্যক?] [كيف يتعامل المفتي مع الخلاف الفقهي في المسئلة؟ وهل يجب عليه ذكر أقوال الأئمة في الجواب؟]

প্রশ্ন-৬৮: [ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর ফাতাওয়ার উপর সময় ও স্থানের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। তাঁর পরিবেশ কীভাবে তাঁর গ্রন্থকে প্রভাবিত করেছিল?] [اشرح العامل الزماني والمكاني في تأثير فتاوى الإمام سراج الدين - وكيف أثرت بيئته في كتابه؟]

প্রশ্ন-৬৯: [ভুলবশত হত্যা (ক্বাতলে খাতা) এবং ইচ্ছাকৃতের সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা (ক্বাতলে শিবহে আমদ)-এর বিধান সম্পর্কে আলোচনা কর। দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?] [تحدث عن أحكام قتل الخطأ وشبه العمد - وما هو الفرق بينهما في وجوب الدية والكفارة؟]

জানাযা : جنازة

প্রশ্ন-১৪: সিরাজিয়াহ-এর জানাযা অধ্যায়ে বর্ণিত মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো এবং তার পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত আহকাম বা বিধানগুলো কী কী?

(ما هي الأحكام المتعلقة بغسل الميت وكيفيته، كما وردت في باب الجنائز من السراجية؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে মানবদেহের সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম। মানুষ জীবিত থাকাবস্থায় যেমন সম্মানিত, মৃত্যুর পরেও তার দেহকে সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। এই সম্মানের অন্যতম একটি অংশ হলো মৃত ব্যক্তিকে শরীয়তসম্মত উপায়ে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো এবং দাফন করা। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে মৃত ব্যক্তির গোসল বা 'গাসলুল মাইয়্যিত' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি মুসলিম সমাজের ওপর একটি 'ফরজে কিফায়া' দায়িত্ব।

২. গোসলের শরঈ হুকুম (الحكم الشرعي): মৃত মুসলমানকে গোসল দেওয়া জীবিতদের ওপর **ফরজে কিফায়া** (فرض الكفاية)। অর্থাৎ, সমাজের কিছু লোক যদি এই দায়িত্ব পালন করে তবে সবাই দায়মুক্ত হবে। কিন্তু কেউ যদি পালন না করে, তবে এলাকাবাসী সবাই গুনাহগার হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন: "তোমরা তাকে পানি ও বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও।"

৩. গোসলের প্রয়োজনীয় উপকরণ (أدوات الغسل): গোসল কার্য সম্পাদন করার জন্য নিম্নোক্ত জিনিসগুলো প্রস্তুত রাখা সুন্নাত:

- উষ্ণ বা হালকা গরম পানি।
- বরই পাতা (সিদর) বা সাবান (পরিষ্কার করার জন্য)।
- কর্পূর (সুগন্ধির জন্য)।
- গোসল দেওয়ার জন্য একটি তক্তা বা খাট।

৪. গোসল দেওয়ার পদ্ধতি (كيفية الغسل): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এবং হানাফি ফিকহ অনুযায়ী গোসল দেওয়ার সুন্নাত পদ্ধতি নিচে ধাপাকারে বর্ণনা করা হলো:

- **১ম ধাপ (তক্তায় শয়ন):** প্রথমে মৃতদেহকে একটি উঁচু তক্তা বা খাটে শুইয়ে দিতে হবে এবং লজ্জাস্থান থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে (সতর ঢাকা ফরজ)।

- **২য় ধাপ (ইস্তিঞ্জা):** গোসলদাতা হাতে কাপড় বা গ্লাভস পেঁচিয়ে মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান পরিষ্কার করবেন (ইস্তিঞ্জা করাবেন)। এ সময় সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা বা দেখা হারাম।

- **৩য় ধাপ (ওজু):** এরপর তাকে নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করাতে হবে। তবে মুখে পানি দেওয়া (কুলি করা) এবং নাকে পানি দেওয়া প্রয়োজন নেই। বরং তুলা ভিজিয়ে দাঁত ও নাকের ছিদ্র মুছে দিতে হবে। তবে মৃত ব্যক্তি যদি অপবিত্র (জুনুব) বা হায়েজ অবস্থায় মারা যায়, তবে কুলি ও নাকে পানি পৌঁছানো জরুরি। কান ও নাক তুলা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া ভালো যাতে পানি না ঢোকে।

- **৪র্থ ধাপ (পানি ঢালা):** প্রথমে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে মাথা ও দাড়ি ধৌত করতে হবে। এরপর বাম কাতে শুইয়ে ডান দিকে পানি ঢালতে হবে যাতে পানি নিচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর ডান কাতে শুইয়ে বাম দিকে পানি ঢালতে হবে।

- **৫ম ধাপ (বসা ও পেট মর্দন):** এরপর মৃতকে নিজের দিকে ঠেস দিয়ে সামান্য বসিয়ে আলতোভাবে পেটে হাত বুলাতে হবে। যদি কোনো ময়লা বের হয়, তবে শুধু তা ধুয়ে ফেলতে হবে, পুনরায় ওজু বা গোসল করাতে হবে না।

- **৬ষ্ঠ ধাপ (মুছে ফেলা ও সুগন্ধি):** সবশেষে পুরো শরীর তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলতে হবে এবং মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি (হুনুত/আতর) লাগাতে হবে। সিজদার স্থানগুলোতে কর্পুর লাগানো মুস্তাহাব।

৫. গোসল সংক্রান্ত বিশেষ বিধান ও মাসয়ালা (أحكام خاصة): ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) গোসল সংক্রান্ত কিছু বিশেষ অবস্থার মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন:

- **পুরুষ ও নারীর বিধান:** পুরুষকে পুরুষ এবং নারীকে নারী গোসল দেবে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারীকে বা নারী কোনো পুরুষকে গোসল দিতে পারবে না।

- **স্বামী-স্ত্রীর বিধান (হানাফি মত):** হানাফি মাযহাব অনুযায়ী, স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে গোসল দিতে পারবে। কিন্তু স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে গোসল দিতে পারবে না। কারণ, স্ত্রীর মৃত্যুর সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক (নিকাহ) ছিন্ন হয়ে যায়। তবে স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ না করে কেবল তায়াম্মুম করিয়ে দিতে পারে যদি কোনো নারী পাওয়া না যায়।

- **শিশুর বিধান:** যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু (যৌন আকর্ষণের বয়সের নিচে) মারা যায়, তবে তাকে পুরুষ বা নারী যে-কেউ গোসল দিতে পারে।

- **অমুসলিম আত্মীয়:** যদি কোনো মুসলমানের অমুসলিম পিতা বা আত্মীয় মারা যায়, তবে তাকে সুন্নাত তরিকায় গোসল দেওয়া হবে না, বরং কেবল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

৬. পানিতে ডুবে বা পুড়ে মারা গেলে: যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা গেছে এবং তার শরীর ফুলে গেছে বা পচে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তার শরীরে পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। ঘষামাজা করার প্রয়োজন নেই।

৭. উপসংহার (خاتمة): মৃতের গোসল কেবল একটি প্রথা নয়, বরং এটি একটি ইবাদত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত এই পদ্ধতি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও পবিত্রতার প্রতীক। গোসলদাতাকে অবশ্যই বিশ্বস্ত ও আমানতদার হতে হবে এবং মৃতের কোনো শারীরিক ত্রুটি দেখলে তা গোপন রাখতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে আমরা মৃতের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাবোধ ও শরঈ দায়িত্ব পালন করতে পারি।

প্রশ্ন-১৫: হানাফী ফিকহে জানাযার নামাযের শর্তাবলি ও রুকন (ফরজ) কী কী? সিরাজিয়াহ-এর লেখক এ বিষয়ে কী কী বক্তব্য উল্লেখ করেছেন?
(ما هي شروط صلاة الجنازة وأركانها في الفقه الحنفي؟ وما هي الأقوال التي أوردها صاحب السراجية في ذلك؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): জানাযার নামাজ মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার একটি সামষ্টিক দুআ। এটি জীবিত মুসলিমদের ওপর 'ফরজে কিফায়া'। এই নামাজের গঠন সাধারণ নামাজের চেয়ে ভিন্ন—এতে কোনো রুকু বা সিজদা নেই, কেবল দাঁড়িয়ে দুআ করতে হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে জানাযার নামাজের শর্ত ও

রুকনগুলো হানাফি ফিকহের আলোকে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এই শর্ত ও রুকনগুলো জানা আবশ্যক।

২. জানাযার নামাজের শর্তাবলি (شروط صلاة الجنازة): ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) জানাযার নামাজের শর্তগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: **(ক) নামাজি ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্ত:** সাধারণ নামাজের জন্য যে শর্তগুলো প্রযোজ্য, জানাযার জন্যও সেগুলো প্রযোজ্য। যথা:

- **পবিত্রতা (তাহারাত):** শরীর, কাপড় ও জায়গা পবিত্র হতে হবে। ওজু বা প্রয়োজনে তায়াম্মুম থাকতে হবে।
- **সতর ঢাকা:** শরীরের নির্দিষ্ট অংশ ঢাকা থাকতে হবে।
- **কিবলামুখী হওয়া:** কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।
- **নিয়ত করা:** মনে মনে জানাযার নামাজের সংকল্প করা।

(খ) মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্ত:

- **মুসলমান হওয়া:** মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। কাফের বা মুরতাদের জানাযা পড়া জায়েয নেই।
- **পবিত্রতা:** মৃতদেহ ও কাফন নাপাকি থেকে পবিত্র হতে হবে। গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করা আবশ্যক।
- **উপস্থিতি:** মৃতদেহ বা লাশ মুসল্লিদের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। হানাফি মাযহাবে 'গায়েবানা জানাযা' (অনুপস্থিত লাশের জানাযা) জায়েয নেই।
- **জমিনে থাকা:** লাশ মাটিতে বা খাটে রাখা থাকতে হবে। বাহনের ওপর বা কাঁধে থাকা অবস্থায় জানাযা হবে না।
- **সামনে থাকা:** লাশ ইমাম ও মুসল্লিদের সামনে থাকতে হবে। লাশের পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে তা শুদ্ধ হবে না।

৩. জানাযার নামাজের রুকন বা ফরজসমূহ (أركان صلاة الجنازة): হানাফি ফিকহ ও 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' অনুযায়ী জানাযার নামাজের রুকন বা মূল স্তম্ভ হলো দুটি:

- **১. চার তাকবীর (التكبيرات الأربع):** জানাযার নামাজে চারটি তাকবীর বলা ফরজ। প্রতিটি তাকবীর এক এক রাকাতের স্থলাভিষিক্ত। ইমাম যদি কোনো একটি তাকবীর বাদ দেন, তবে নামাজ হবে না।
    - **প্রথম তাকবীর:** তাহরীমা বা শুরুর তাকবীর।
    - **পরবর্তী তিন তাকবীর:** সানা, দুরুদ ও দুআ পাঠের জন্য।
- **২. কিয়াম বা দাঁড়ানো (القيام):** সম্পূর্ণ নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। বিনা ওজরে বসে বা বাহনে চড়ে জানাযার নামাজ পড়া জায়েয নেই। রুকু-সিজদা না থাকায় পুরোটাই কিয়ামের অন্তর্ভুক্ত।

(দ্রষ্টব্য: সালাম ফেরানো হানাফি মতে ওয়াজিব, রুকন নয়। তবে এটি নামাজের সমাপ্তি নির্দেশক।)

৪. জানাযার নামাজের সুন্নাত পদ্ধতি (كيفية الصلاة): সিরাজিয়াহ গ্রন্থের আলোকে নামাজের পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- ইমাম মৃতের বক্ষ বা সিনার বরাবর দাঁড়াবেন।
- **প্রথম তাকবীরে:** 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ সানা পাঠ করবেন।
- **দ্বিতীয় তাকবীরে:** 'দুরুদে ইব্রাহিম' বা নামাজের দুরুদ পাঠ করবেন।
- **তৃতীয় তাকবীরে:** মৃত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করবেন। বালেগ হলে মাগফিরাতের দুআ, আর শিশু হলে তাকে আখেরাতের নাজাতের ওসিলা বানানোর দুআ।
- **চতুর্থ তাকবীরে:** কোনো দুআ নেই, এরপর ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন।

৫. মতভেদ ও হানাফি অবস্থান (الاختلاف والمذهب الحنفي): সূরা ফাতিহা পাঠ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

- **শাফেয়ী মাযহাব:** জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ বা রুকন।

- **হানাফি মাযহাব (ইমাম সিরাজুদ্দীনের মত):** জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের নিয়তে পড়া মাকরূহ। তবে সানা বা দুআ হিসেবে পড়া জায়েয। কারণ, এই নামাজ মূলত দুআ করার জন্য, কিরাত পড়ার জন্য নয়।

৬. একাধিক জানাযা হলে: যদি একাধিক লাশ উপস্থিত থাকে, তবে হানাফি মতে উত্তম হলো প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা জানাযা পড়া। তবে সবার জন্য একবার নামাজ পড়াও জায়েয আছে। সেক্ষেত্রে লাশগুলো ইমামের সামনে সারিবদ্ধভাবে রাখতে হবে।

৭. উপসংহার (خاتمة): জানাযার নামাজ মৃত ভাইয়ের জন্য শেষ বিদায়ী উপহার। এর শর্ত ও রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে লাশের উপস্থিতি এবং পবিত্রতার শর্তগুলো হানাফি ফিকহে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে পালন করা হয়। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এই নামাজ আদায় করলে তা মৃতের জন্য রহমত এবং জীবিতদের জন্য সওয়াবের কারণ হবে।

প্রশ্ন-১৬: হানাফী ফিকহে শহীদ ব্যক্তির জন্য বিশেষ বিধান কী? জানাযার ক্ষেত্রে সাধারণ মৃত ব্যক্তির চেয়ে শহীদের বিধান কীভাবে আলাদা?
ما هي الأحكام الخاصة بالشهيد في الفقه الحنفي؟ وكيف تميزت أحكامه عن (الميت العادي في الجنائز؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে শাহাদাত বা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করা সর্বোচ্চ মর্যাদার কাজ। শহীদরা আল্লাহর কাছে জীবিত এবং বিশেষ সম্মানের অধিকারী। এই সম্মানের কারণে দুনিয়াতেও তাদের কাফন-দাফনের বিধানে সাধারণ মৃত ব্যক্তিদের চেয়ে ভিন্নতা রয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে শহীদের প্রকারভেদ এবং তাদের বিশেষ বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. শহীদের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ (تعريف الشهيد وأقسامه): শহীদ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বা অন্যায়ভাবে নিহত হয়। ফিকহী পরিভাষায় শহীদ দুই প্রকার:

- **১. দুনিয়াবি ও পরকালীন শহীদ (الشهيد الحقيقي):** যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছে অথবা যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং

সে দুনিয়াবি কোনো সুবিধা (মালের বিনিময়) পায়নি। এদের বিধান সম্পূর্ণ আলাদা।

- **২. কেবল পরকালীন শহীদ (الشهيد الحكمي):** যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, মহামারীতে বা পেটের পীড়ায় মারা গেছে। এরা পরকালে শহীদের সওয়াব পাবে কিন্তু দুনিয়াতে তাদের বিধান সাধারণ মৃতের মতোই (গোসল ও সাধারণ কাফন দেওয়া হবে)।

৩. প্রকৃত শহীদের বিশেষ বিধানসমূহ (أحكام الشهيد الكامل): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' অনুযায়ী প্রকৃত শহীদের জন্য তিনটি মূল বিধান রয়েছে যা সাধারণ মৃত থেকে আলাদা:

(ক) গোসল না দেওয়া (عدم الغسل): শহীদকে গোসল দেওয়া হবে না। তার শরীরের রক্ত ধোয়া হবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদদের সম্পর্কে বলেছিলেন: "তাদেরকে তাদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করো।" তাদের রক্ত কিয়ামতের দিন মিশকের সুঘ্রাণ ছড়াবে।

(খ) রক্তমাখা কাপড়ে দাফন (الدفن في ثيابه): শহীদকে নতুন কাফন পরানোর প্রয়োজন নেই। সে যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় শহীদ হয়েছে, সেই কাপড়েই তাকে দাফন করা হবে। তবে যদি শরীরে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তু (যেমন জুতা, বর্ম, অস্ত্র, তুলা বা পশমের জ্যাকেট) থাকে, তবে তা খুলে ফেলা হবে। আর যদি পরিহিত কাপড় সুন্নাত কাফনের (তিন কাপড়) চেয়ে কম হয়, তবে তা পূর্ণ করা হবে, কিন্তু শরীরের রক্তমাখা কাপড় খোলা হবে না।

(গ) জানাযার নামাজ আদায় করা (الصلاة عليه): এখানে হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে।

- **হানাফি মাযহাব:** শহীদের জানাযার নামাজ পড়া **ওয়াজিব**। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত হামজা (রা.) এবং উহুদের শহীদদের জানাযা পড়েছিলেন বলে শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া জানাযা হলো দুআ, আর শহীদ এই দুআর মুখাপেক্ষী।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** তাদের মতে শহীদের জানাযার নামাজ পড়া হয় না।

৪. সাধারণ মৃত ও শহীদের বিধানের পার্থক্য (ছক):

বিষয়	সাধারণ মৃত ব্যক্তি	শহীদ (প্রকৃত)
গোসল	গোসল দেওয়া ফরজ।	গোসল দেওয়া হারাম/নিষিদ্ধ (হানাফি মতে)।
রক্ত	শরীর থেকে নাপাকি ও রক্ত ধুয়ে ফেলতে হয়।	রক্ত ধোয়া যাবে না, তা সম্মানের প্রতীক।
কাফন	সুন্নাত তরিকায় ৩টি নতুন সাদা কাপড় পরানো হয়।	পরিহিত রক্তমাখা কাপড়েই দাফন করা হয়।
শরীরের কাপড়	পুরাতন কাপড় খুলে ফেলা হয়।	শরীরের কাপড় রেখে দেওয়া হয় (বর্ম বা অস্ত্র ছাড়া)।

৫. শহীদ হওয়ার শর্তাবলি (شروط الشهادة): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী কাউকে দুনিয়াবি বিধানে শহীদ গণ্য করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকা আবশ্যক:

- **মুসলমান হওয়া:** অমুসলিম শহীদ হবে না।
- **পবিত্র হওয়া:** বড় নাপাকি (গোসল ফরজ হওয়া), হায়েজ বা নিফাস অবস্থায় নিহত হলে তাকে গোসল দিতে হবে।
- **বালেগ ও বিবেকবান হওয়া:** পাগল বা নাবালক নিহত হলে তাকে গোসল দিতে হবে (ইমাম আবু ইউসুফের মতে)।
- **ঘটনাস্থলে মৃত্যু:** আঘাত পাওয়ার পর যদি সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কিন্তু যদি আঘাত পাওয়ার পর সে দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকে, কথাবার্তা বলে, পানাহার করে বা চিকিৎসা গ্রহণ করে, তবে সে 'দুনিয়াবি শহীদ' থাকবে না। তাকে গোসল ও সাধারণ কাফন দিতে হবে। একে 'ইরতিস' (ارتثاث) বলা হয়।

৬. উপসংহার (خاتمة): শহীদের বিধান ইসলামি শরীয়তে তার আত্মত্যাগের স্বীকৃতিরূপ। তাকে গোসল না দেওয়া এবং রক্তমাখা কাপড়ে দাফন করা প্রমাণ করে যে, তার এই অবস্থা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে হানাফি মাযহাবের এই সূক্ষ্ম বিধানগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষ করে জানাযার নামাজের আবশ্যকতা এবং আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর বেঁচে থাকার সময়কালের শর্তগুলো বিচারিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

الأيمان : কসম/শপথ

প্রশ্ন-১৭: হানাফী ফিকহে 'কসম/শপথ' (আল-ঈমান) অধ্যায়ের পরিচয় দাও। সিরাজুদ্দীন কসমের যে প্রকারভেদ ও বিভাগগুলো উল্লেখ করেছেন তা কী কী?
(عرف باب "الأيمان" في الفقه الحنفي - وما هي أنواع اليمين وأقسامها كما أوردها سراج الدين؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে মানুষের মুখের কথা ও অঙ্গীকারের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ বিভিন্ন সময় নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য বা কোনো কাজ করার বা না করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করার জন্য মহান আল্লাহর নাম ব্যবহার করে থাকে, যা ফিকহের পরিভাষায় 'কসম' বা 'শপথ' নামে পরিচিত। হানাফি ফিকহে এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, কারণ এর সাথে আল্লাহর নামের মর্যাদা এবং শরঈ বিধান (কাফফারা) জড়িত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) কসমের পরিচয় ও প্রকারভেদ অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

২. কসমের পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف اليمين): কসম বা শপথ-এর আরবি প্রতিশব্দ হলো **'আল-আইমান'** (الأيمان)। এটি 'ইয়ামিন' (يمين) শব্দের বহুবচন।

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইয়ামিন' শব্দের মূল অর্থ হলো 'শক্তি' (Quwwat) বা 'ডান হাত'। যেহেতু মানুষ কসম বা চুক্তির সময় একে অপরের ডান হাত ধরে অথবা কসমের মাধ্যমে নিজের কথাকে শক্তিশালী করে, তাই একে ইয়ামিন বলা হয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে— *"মহান আল্লাহর নাম বা তাঁর কোনো গুণবাচক সিফাত উল্লেখ করে কোনো বিষয়ে নিজের সংকল্পকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করাকে কসম বা ইয়ামিন বলে।"*

৩. কসমের প্রকারভেদ (أقسام اليمين): ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) এবং হানাফি ফিকহবিদগণ সময়ের প্রেক্ষাপট ও কসমের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে কসমকে প্রধানত **তিন ভাগে** বিভক্ত করেছেন। প্রতিটি ভাগের হুকুম ও ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন। নিচে ছক ও বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো:

(ক) ইয়ামিনে গামুস (اليمين الغموس - মিথ্যা কসম):

- **সংজ্ঞা:** অতীত বা বর্তমান কালের কোনো ঘটনার ব্যাপারে জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কসম খাওয়া। অর্থাৎ, ব্যক্তি জানে যে সে মিথ্যা বলছে, তবুও আল্লাহর নামে কসম করে।

- **নামকরণ:** 'গামুস' অর্থ ডুবিয়ে দেওয়া। এই কসম কসমকারীকে গুনাহের মধ্যে বা জাহান্নামের আগুনে ডুবিয়ে দেয় বলে এর এই নাম।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, "আল্লাহর কসম! আমি অমুক কাজটি করেছি", অথচ সে জানে যে সে তা করেনি।

- **হুকুম:** এটি কবীরা গুনাহ বা হারাম। হানাফি মাযহাব মতে, এর জন্য কোনো কাফফারা নেই। কারণ এটি এত বড় অপরাধ যে, কাফফারা দিয়ে এর পাপ মোচন হয় না। এর একমাত্র প্রতিকার হলো খালেস দিলে আল্লাহর কাছে তওবা করা।

(খ) ইয়ামিনে মুনআকিদাহ (اليمين المنعقدة - কার্যকর কসম):

- **সংজ্ঞা:** ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজ করা বা না করার ব্যাপারে আল্লাহর নামে কসম খাওয়া।

- **নামকরণ:** 'মুনআকিদাহ' অর্থ গিট দেওয়া বা আবদ্ধ করা। যেহেতু এই কসমের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে কোনো কাজের সাথে আবদ্ধ করে ফেলে, তাই একে মুনআকিদাহ বলা হয়।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, "আল্লাহর কসম! আমি আগামীকাল মাদরাসায় যাব না" অথবা "আল্লাহর কসম! আমি এই কাজটি করব।"

- **হুকুম:** এই কসম রক্ষা করা ওয়াজিব। যদি কেউ এই কসম ভঙ্গ করে (অর্থাৎ যা বলেছিল তার বিপরীত করে), তবে তার ওপর কাফফারা (জরিমানা) আদায় করা ওয়াজিব হবে।

(গ) ইয়ামিনে লুগু (اللغو اليمين - অসার বা ভুল কসম):

- **সংজ্ঞা:** অতীত বা বর্তমান কালের কোনো ঘটনার ব্যাপারে কসম খাওয়া, যেখানে কসমকারী প্রবল ধারণা (গুমান) করে যে সে সত্য বলছে, কিন্তু বাস্তবে তা মিথ্যা। অথবা কথাবার্তায় অভ্যাসবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে 'আল্লাহর কসম' বলে ফেলা।

- **উদাহরণ:** কেউ নিশ্চিত মনে করে বলল, "আল্লাহর কসম! জায়েদ এসেছে", কিন্তু পরে দেখা গেল জায়েদ আসেনি। বক্তা মনে করেছিল সে সত্য বলছে।

- **হুকুম:** হানাফি মাযহাব মতে, এই ধরনের কসমে কোনো গুনাহ নেই এবং কোনো কাফফারাও নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের অসার কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।"

৪. প্রকারভেদের তুলনামূলক ছক:

কসমের নাম	কাল (Time)	প্রকৃতি	হুকুম (Hukum)
গামুস	অতীত/বর্তমান	ইচ্ছাকৃত মিথ্যা	কবীরা গুনাহ, কাফফারা নেই, তওবা জরুরি।
মুনআকিদাহ	ভবিষ্যৎ	কোনো কাজের সংকল্প	রক্ষা করা ওয়াজিব, ভাঙলে কাফফারা ওয়াজিব।
লুগু	অতীত/বর্তমান	ভুল ধারণা/অনিচ্ছাকৃত	কোনো গুনাহ নেই, কাফফারা নেই।

৫. উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) কসমকে মানুষের নিয়ত ও সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। মুফতি ও বিচারকদের জন্য এই প্রকারভেদ জানা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, কেউ মিথ্যা কসম খেলে তাকে কাফফারার আদেশ দেওয়া যাবে না (হানাফি মতে), বরং তওবার নসিহত করতে হবে। আবার ভবিষ্যৎ কসম ভাঙলে অবশ্যই কাফফারা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-১৮: কসম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী এবং কখন কসম কার্যকর হয় এবং হানাফীদের মতে কখন কাফফারা ওয়াজিব হয়?

(ما هي شروط صحة اليمين ومتى تنعقد اليمين وتؤدي إلى وجوب الكفارة عند الحنفية؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): আল্লাহর নাম নিয়ে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্যই শরীয়তের দৃষ্টিতে কসম হিসেবে গণ্য হয় না। কসম শুদ্ধ বা 'সহীহ' হওয়ার জন্য এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও রুকন পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে হানাফি ফিকহের আলোকে কসমের এই শর্তাবলি ও কাফফারার বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

২. কসম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة اليمين): একটি কসম শরীয়তসম্মতভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি প্রধান শর্ত রয়েছে:

(ক) কসমকারীর যোগ্যতা (Ahliyyah): কসমকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই তিনটি গুণের অধিকারী হতে হবে:

- **ইসলাম:** কসমকারীকে মুসলমান হতে হবে। কাফেরের কসম শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- **আকল (বুদ্ধিমত্তা):** তাকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগলের কসম ধর্তব্য নয়।
- **বুলুগ (প্রাপ্তবয়স্ক):** নাবালক বা শিশুর কসম কার্যকর হয় না।

(খ) কসমের বিষয়বস্তু (Mahall):

- কসমটি অবশ্যই এমন বিষয়ে হতে হবে যা সম্ভবপর। অসম্ভব কোনো বিষয়ে কসম কার্যকর হয় না। (যেমন: "আল্লাহর কসম! আমি আকাশে উড়ে যাব"—এটি কসম হিসেবে গণ্য হবে না, বরং অসার কথা হবে)।
- কসমটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত হতে হবে (কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য)।

(গ) কসমের শব্দাবলি (Sigha): কসম অবশ্যই আল্লাহর নাম বা তাঁর সত্তাগত গুণাবলি দিয়ে হতে হবে।

- **গ্রহণযোগ্য:** "আল্লাহর কসম", "রহমানের কসম", "আল্লাহর ইজ্জতের কসম", "কুরআনের কসম" ইত্যাদি।
- **অগ্রহণযোগ্য:** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া শিরক বা নাজায়েয এবং তা কসম হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন—নবীর কসম, কাবার কসম, বা পিতার কসম খাওয়া ফিকহী দৃষ্টিতে কসম নয় এবং এর জন্য কোনো কাফফারা নেই।

৩. কসম কখন কার্যকর বা 'মুনআকিদ' হয়? (متى تنعقد اليمين؟): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী কসম তখনই কার্যকর হয় যখন:

১. কসমকারী ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজ করা বা না করার ওপর কসম করে।

২. সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় (ঠাট্টাচ্ছলে হলেও) কসমের শব্দ উচ্চারণ করে। হানাফি মাযহাবে কসমের ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়তের চেয়ে মুখের উচ্চারণকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তিনটি বিষয় এমন—যা সিরিয়াসলি করলেও কার্যকর, ঠাট্টা করে করলেও কার্যকর: বিবাহ, তালাক এবং কসম।"

৪. কাফফারা কখন ওয়াজিব হয়? (متى تجب الكفارة؟): হানাফি মাযহাব মতে, কসম করলেই কাফফারা দিতে হয় না। কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে:

- **প্রথমত:** কসমটি **'ইয়ামিনে মুনআকিদাহ'** হতে হবে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। (অতীতের মিথ্যা কসম বা গামুস-এর ওপর কাফফারা নেই)।

- **দ্বিতীয়ত:** সেই কসমটি **ভঙ্গ (Hinth)** করতে হবে। কসম খাওয়ার পর যদি ব্যক্তি তার কসম রক্ষা করে, তবে কোনো কাফফারা নেই। কিন্তু যদি সে কসমের বিপরীত কাজ করে, তখনই কাফফারা ওয়াজিব হয়।

- **তৃতীয়ত:** কসম ভঙ্গ করার সময় কসমের কথা স্মরণ থাকা জরুরি নয়। ভুলে ভঙ্গ করলেও কাফফারা দিতে হবে। এমনকি জোরপূর্বক (Ikrah) কসম ভঙ্গ করানো হলেও হানাফি মতে কাফফারা দিতে হবে।

৫. কাফফারার পরিমাণ ও পদ্ধতি: কসম ভঙ্গ করলে শরীয়ত নির্ধারিত যে কাফফারা দিতে হয়, তা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়েদায় বর্ণিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ:

- **প্রথম ধাপ (ইচ্ছাধিকার):** নিচের তিনটি কাজের যেকোনো একটি করার স্বাধীনতা রয়েছে: ১. ১০ জন মিসকীনকে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়ানো। ২. অথবা ১০ জন মিসকীনকে পরিধেয় বস্ত্র (কাপড়) দান করা। ৩. অথবা একটি গোলাম (দাস) আজাদ করা।

- **দ্বিতীয় ধাপ (বাধ্যতামূলক):** যদি ওপরের তিনটি কাজের কোনোটি করার আর্থিক সামর্থ্য না থাকে, তবে **ধারাবাহিকভাবে ৩টি রোজা** রাখতে হবে। সামর্থ্য থাকার পরও রোজা রাখলে কাফফারা আদায় হবে না।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, কসম একটি পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কিছুর কসম যেমন শুদ্ধ নয়, তেমনি ভবিষ্যৎ কসম ভঙ্গ করলে কাফফারা দেওয়া আবশ্যক। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এই শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন, যাতে মানুষ কসমের অপব্যবহার না করে এবং ভঙ্গ করলে সঠিক পন্থায় প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে।

প্রশ্ন-১৯: 'আল-ইয়ামিনুল গামুস' (মিথ্যা কসম) এবং 'আল-ইয়ামিনুল লাগব' (অসার কসম)-এর মাসয়ালা এবং কাফফারা সম্পর্কিত বিধানগুলো গ্রন্থে কীভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
اشرح مسألة "اليمين الغموس" و "اليمين اللغو" وأحكامهما المتعلقة بالكفارة في الكتاب.)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর নামে শপথ বা কসম করা একটি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়। যত্রতত্র কসম খাওয়াকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী অতীত বা বর্তমান কালের কোনো ঘটনার ওপর ভিত্তি করে যে কসম খাওয়া হয়, তা দুই প্রকার: 'আল-ইয়ামিনুল গামুস' এবং 'আল-ইয়ামিনুল লাগব'। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই দুই প্রকার কসমের সংজ্ঞা, হুকুম এবং কাফফারার বিধান অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিচারিক ও দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম।

২. আল-ইয়ামিনুল গামুস (اليمين الغموس)-এর বিবরণ: হানাফি ফিকহে সবচেয়ে ভয়াবহ কসম হলো 'ইয়ামিনুল গামুস'।

- **সংজ্ঞা (تعريف):** 'গামুস' শব্দটি 'গমস' (غمس) মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ ডুবিয়ে দেওয়া। পরিভাষায়, অতীত বা বর্তমানের কোনো মিথ্যা ঘটনার ওপর জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করাকে 'ইয়ামিনুল গামুস' বলে। একে 'গামুস' বলা হয় কারণ, এই মিথ্যা কসম শপথকারীকে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়, অথবা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়।

উদাহরণ: কেউ বলল, "وَاللهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا" (আল্লাহর কসম! আমি এই কাজটি করিনি), অথচ সে জানে যে সে কাজটি করেছে।

- **হুকুম ও বিধান (الحكم):** ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর মতে এবং হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'ইয়ামিনুল গামুস' করা কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ। এর জন্য কোনো কাফফারা নেই। এর একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহর কাছে খাঁটি দিলে তওবা করা এবং ইস্তিগফার করা। যদি এই মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কারো হক নষ্ট করা হয়, তবে সেই হক ফিরিয়ে দেওয়া বা পাওনাদারের কাছে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক।

- **কাফফারা না থাকার কারণ:** হানাফি মাযহাব মতে, কাফফারা হলো এক প্রকার 'ইবাদত' যা পাপ মোচন করে। কিন্তু 'ইয়ামিনুল গামুস'-এর পাপ এত বিশাল যে, তা সামান্য কাফফারা (খাদ্য বা বস্ত্র দান) দ্বারা মোচন হতে পারে না। যেমন ইচ্ছাকৃত হত্যার (ক্বাতলে আমদ) কোনো কাফফারা নেই, তেমনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসমেরও কোনো কাফফারা নেই।

- **ইমাম শাফেয়ীর সাথে মতভেদ (اختلاف الفقهاء):**
    - **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, ইয়ামিনুল গামুসের ক্ষেত্রেও কাফফারা ওয়াজিব হবে। তিনি একে 'ইয়ামিনুল মুনআকিদা' (ভবিষ্যৎ কসম)-এর ওপর কিয়াস করেন।
    - **হানাফিদের দলিল:** কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অসার কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন ওই কসমের জন্য যা তোমরা দৃঢ়ভাবে করেছ (ভবিষ্যতের জন্য)।" অতীতকালের মিথ্যা কসমের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা এবং এটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের শামিল, তাই এখানে কাফফারার সুযোগ নেই।

৩. আল-ইয়ামিনুল লাগব (اليمين اللغو)-এর বিবরণ: কসমের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো 'ইয়ামিনুল লাগব' বা অসার কসম।

- **সংজ্ঞা (تعريف):** 'লাকব' অর্থ অনর্থক বা অসার। পরিভাষায়, অতীত বা বর্তমানের কোনো ঘটনার ব্যাপারে শপথকারীর ধারণা হলো ঘটনাটি সত্য, এবং সেই ধারণার ওপর ভিত্তি করে সে কসম খেল, কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটি

মিথ্যা। অর্থাৎ, অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত ভুল তথ্যের ওপর কসম খাওয়া। অথবা, কথাবার্তার প্রবাহে অভ্যাসবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে "আল্লাহর কসম", "না, আল্লাহর কসম" বলা। **উদাহরণ:** কেউ দেখল দূরে একটি পাখি বসে আছে। সে মনে করল এটি কাক। তাই বলল, **"وَاللهِ إِنَّهُ غُرَابٌ"** (আল্লাহর কসম! এটি একটি কাক)। কিন্তু পরে দেখা গেল সেটি আসলে চিল। যেহেতু সে সত্য মনে করে কসম খেয়েছে, তাই এটি 'ইয়ামিনুল লাগব'।

- **হুকুম ও বিধান (الحكم):** 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' অনুযায়ী, এই ধরণের কসমের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে পাকড়াও করবেন না। এর জন্য কোনো গুনাহ হবে না এবং কোনো কাফফারাও দিতে হবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: **"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"** (আল্লাহ তোমাদের অসার কসমের জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না)।

৪. গামুস ও লাগব-এর মধ্যে পার্থক্য (ছক):

বিষয়	আল-ইয়ামিনুল গামুস	আল-ইয়ামিনুল লাগব
ইচ্ছা ও জ্ঞান	জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়।	সত্য মনে করে বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে ভুল হয়।
সময়কাল	অতীত বা বর্তমান কালের ঘটনা।	অতীত বা বর্তমান কালের ঘটনা।
শরঈ হুকুম	কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ।	কোনো গুনাহ নেই।
কাফফারা	হানাফি মতে কাফফারা নেই (শুধু তওবা)।	কোনো কাফফারা নেই।
পরিণতি	জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত (তওবা না করলে)।	আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

৫. উপসংহার (خاتمة): কসম বা শপথ অধ্যায়ে 'ইয়ামিনুল গামুস' এবং 'ইয়ামিনুল লাগব'-এর পার্থক্য বোঝা একজন মুফতি ও বিচারকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। 'ইয়ামিনুল গামুস' সমাজে মিথ্যা ও প্রতারণা ছড়ায়, তাই এর শাস্তি ও পাপ কঠোর। অন্যদিকে 'ইয়ামিনুল লাগব' মানুষের ভুলের উর্ধ্বে। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) হানাফি উসুল অনুযায়ী এই বিধানগুলো অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা আমাদের জিহ্বা সংযত রাখার শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন-২০: কোনো শর্তের সাথে যুক্ত কসমের ক্ষেত্রে 'শপথ ভঙ্গ' (আল-হিনস) কীভাবে বাস্তবায়িত হয়? এবং সে ধরনের কিছু কসমের উদাহরণ কী কী?
كيف يتحقق الحنث (الحلف) في اليمين المعلقة على شرط؟ وما هي بعض صور اليمين المعلقة المذكورة؟

১. ভূমিকা (مقدمة): কসম বা শপথ সাধারণত দুইভাবে সংঘটিত হয়: তাৎক্ষণিক (মুনআজ্জাজ) এবং শর্তযুক্ত (মুআল্লাক)। শর্তযুক্ত কসম হলো এমন শপথ, যেখানে কসমের কার্যকারিতাকে কোনো একটি শর্ত বা ঘটনার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। হানাফি ফিকহ এবং 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে শর্তযুক্ত কসম এবং তা ভঙ্গের (হিনস) বিধান অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একে ফিকহের পরিভাষায় 'তালিক' (تعليق) বা ঝুলন্ত কসম বলা হয়।

২. শর্তযুক্ত কসম ও 'হিনস'-এর পরিচয়:

- **শর্তযুক্ত কসম (اليمين المعلقة):** যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে কোনো কাজ করা বা না করার বিষয়টি ভবিষ্যতের কোনো শর্তের ওপর নির্ভর করে শপথ করে।

- **হিনস বা শপথ ভঙ্গ (الحنث):** শপথকারীর ইচ্ছার বিপরীতে শর্তটি পাওয়া যাওয়া বা শপথ রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়াকে 'হিনস' বলে। শর্তযুক্ত কসমের ক্ষেত্রে যখনই শর্তটি পূর্ণ হয় এবং শপথের বিপরীত কাজ করা হয়, তখনই 'হিনস' সাব্যস্ত হয় এবং কাফফারা ওয়াজিব হয়।

৩. শপথ ভঙ্গ (হিনস) বাস্তবায়নের পদ্ধতি: ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, শর্তযুক্ত কসমের ক্ষেত্রে 'হিনস' বা শপথ ভঙ্গ দুটি উপায়ে বাস্তবায়িত হতে পারে:

(ক) কোনো কাজ করার শর্তে কসম (اليمين على الفعل): যদি কেউ কসম করে যে, সে ভবিষ্যতে কোনো একটি কাজ করবে। এক্ষেত্রে যদি সে সেই কাজটি না করে মারা যায় বা কাজটি করার সুযোগ হারিয়ে ফেলে, তবে শেষ মুহূর্তে তার কসম ভঙ্গ বা 'হিনস' হবে।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, **"وَاللهِ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ"** (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই এই ঘরে প্রবেশ করব)।

- **বাস্তবায়ন:** যতদিন সে জীবিত আছে এবং ঘরে প্রবেশের সুযোগ আছে, ততদিন কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি সে ঘরে প্রবেশ না করেই মারা যায়, তবে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার কসম ভঙ্গ হবে এবং কাফফারা তার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে আদায় করা ওয়াজিব হবে।

(খ) কোনো কাজ না করার শর্তে কসম (اليمين على الترك): এটিই সচরাচর বেশি ঘটে। যদি কেউ কসম করে যে, সে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করবে না।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, **"وَاللهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا"** (আল্লাহর কসম! আমি জায়েদের সাথে কথা বলব না)।

- **বাস্তবায়ন:** এই কসম করার পর যেই মুহূর্তে সে জায়েদের সাথে স্বেচ্ছায় কথা বলবে, তখনই শর্ত পাওয়া গেল এবং কসম ভঙ্গ (হিনস) হয়ে গেল। এর ফলে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

(গ) শর্তের সাথে যুক্ত কসম (اليمين بالشرط والجزاء): যদি কেউ বলে, "যদি আমি ওমুকে কাজ করি, তবে আল্লাহর কসম আমি এমনটি করব।"

- **উদাহরণ: "إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَعَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ"** (যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, তবে আমার ওপর এক মাসের রোজা রাখা ওয়াজিব)।

- **বাস্তবায়ন:** এখানে ঘরে প্রবেশ করা হলো 'শর্ত'। যখনই সে ঘরে প্রবেশ করবে, তখনই শর্ত পূরণ হবে এবং তার ওপর এক মাসের রোজা রাখা বা কসমের কাফফারা দেওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে।

৪. গ্রন্থে বর্ণিত শর্তযুক্ত কসমের কিছু বিশেষ উদাহরণ (صور اليمين المعلقة): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে ব্যবহারিক জীবনের কিছু জটিল উদাহরণ দেওয়া হয়েছে:

- **১. সময়সীমার শর্ত:** যদি কেউ বলে, "আল্লাহর কসম! আমি আগামীকালের মধ্যে আমার ঋণ পরিশোধ করব।" **বিধান:** যদি আগামীকালের সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে ঋণ পরিশোধ না করে, তবে সূর্যাস্তের সাথে সাথে তার কসম ভঙ্গ (হিনস) হবে এবং কাফফারা দিতে হবে।

- **২. অন্যের কাজের সাথে যুক্ত শর্ত:** যদি কেউ বলে, "যদি জায়েদ আজ না আসে, তবে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি ভাত খাব না।" **বিধান:**

এখানে কসমটি জায়েদের আসার ওপর নির্ভরশীল। যদি জায়েদ না আসে এবং শপথকারী ভাত খেয়ে ফেলে, তবে কসম ভঙ্গ হবে।

- **৩. প্রবেশ ও বসবাসের কসম:** যদি কেউ কসম করে, "আমি এই ঘরে বসবাস করব না।" অথচ সে তখন সেই ঘরেই আছে। **বিধান:** এই কসম করার পর তাকে তাৎক্ষণিকভাবে আসবাবপত্রসহ ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি সে অযথা দেরি করে বা সেখানে অবস্থান করতে থাকে, তবে তার কসম ভঙ্গ (হিনস) হয়ে যাবে। একে ফিকহের পরিভাষায় 'ইস্তিদামা' বা বিদ্যমান অবস্থা বজায় রাখা বলে, যা নতুন কাজ করার মতোই গণ্য হয়।

৫. শর্তযুক্ত কসমের হুকুম:

- শর্তযুক্ত কসমের ক্ষেত্রে যতক্ষণ শর্ত পাওয়া না যায়, ততক্ষণ কসম ভঙ্গ হয় না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হয় না।

- একবার শর্ত পাওয়া গেলে এবং কসম ভঙ্গ হলে কাফফারা দিতে হয়। হানাফি মাযহাবে শর্তযুক্ত কসমের কাফফারা শর্ত পাওয়ার আগে আদায় করা জায়েয নেই। অর্থাৎ, কসম ভাঙ্গার পরেই কাফফারা দিতে হবে।

৬. উপসংহার (خاتمة): শর্তযুক্ত কসম বা 'আল-ইয়ামিনুল মুআল্লাক' মানুষের মুখের কথার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে কারণ মানুষ রাগের মাথায় বা আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন সব শর্ত আরোপ করে যা পরবর্তীতে পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) দেখিয়েছেন যে, শর্ত পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই কীভাবে শরঈ দায়বদ্ধতা বা 'হিনস' তৈরি হয়, যা সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়ক।

الحدود : শাস্তি/হদ

প্রশ্ন-২১: ইসলামী ফিকহে 'হদ' (শাস্তি)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী হুদুদ (শাস্তি)-এর বিধান দেওয়ার মূল লক্ষ্যগুলো কী?
(عرف "الحد" في الفقه الإسلامي - وما هي أهداف شرعية الحدود كما يشير إليها الفقه الحنفي؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়ত কেবল কিছু ইবাদত বা আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখা, মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করা এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী আইনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান দিয়েছেন, যা ফিকহের পরিভাষায় 'হুদুদ' নামে পরিচিত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এবং হানাফি ফিকহের অন্যান্য গ্রন্থে হুদুদের বিধান ও এর দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। অপরাধ দমন ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে হুদুদের ভূমিকা অপরিসীম।

২. 'হদ'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الحد): 'হুদুদ' (الحدود) শব্দটি 'হদ' (الحد)-এর বহুবচন। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিচে দেওয়া হলো:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** 'হদ' শব্দের মূল অর্থ হলো— প্রতিবন্ধক, সীমা, প্রাচীর বা বাধা। আরবিতে বলা হয়, 'হাদ্দুদ দার' (সীমানা প্রাচীর)। যেহেতু এই শাস্তি অপরাধীকে পুনরায় অপরাধ করা থেকে 'বাধা' দেয় এবং মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, তাই একে 'হদ' বলা হয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে হদ-এর সংজ্ঞা হলো: **"هو عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى"** অর্থ: *"হদ হলো এমন শাস্তি যা শরীয়ত কর্তৃক সুনির্ধারিত এবং যা মহান আল্লাহর হক বা অধিকার হিসেবে বান্দার ওপর ওয়াজিব হয়।"*

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. সুনির্ধারিত (مقدرة): শাস্তির পরিমাণ বা ধরণ নির্দিষ্ট। বিচারক চাইলেই তা বাড়াতে বা কমাতে পারেন না। (যেমন: যিনাকারীর ১০০ বেত্রাঘাত, চোরের হাত কাটা)। ২. **আল্লাহর হক (حق لله):** এটি সমাজের কল্যাণের সাথে জড়িত, তাই একে আল্লাহর হক বলা হয়। ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলেও (যেমন চুরির

মাল ফেরত দিলেও বিচারকের কাছে পৌঁছানোর পর) হদ মাফ হয় না। ৩. **পার্থক্য:** এটি 'কিসাস' (প্রতিশোধ) থেকে ভিন্ন, কারণ কিসাস হলো বান্দার হক। আবার এটি 'তাযীর' (লঘু শাস্তি) থেকেও ভিন্ন, কারণ তাযীর বিচারকের রায়ের ওপর নির্ভরশীল, সুনির্ধারিত নয়।

৩. হানাফী ফিকহ অনুযায়ী হুদুদ-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (أهداف شرعية الحدود): ইসলামী শরীয়তে শাস্তি বা হুদুদ প্রবর্তনের পেছনে মহান আল্লাহর বিশেষ হিকমত বা প্রজ্ঞা রয়েছে। হানাফি ফিকহবিদগণ হুদুদের লক্ষ্যগুলোকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে এবং কয়েকটি উপবিভাগে আলোচনা করেছেন:

(ক) প্রতিরোধ বা বাধা প্রদান (الزواجر): হুদুদের প্রধান লক্ষ্য হলো অপরাধ প্রতিরোধ করা। এটি দুইভাবে কাজ করে:

- **অপরাধীর জন্য বাধা:** যে ব্যক্তি একবার শাস্তি ভোগ করে, সে শাস্তির ভয়ে পুনরায় সেই অপরাধ করার সাহস পায় না।
- **অন্যদের জন্য শিক্ষা:** যখন জনসমক্ষে হদ কার্যকর করা হয়, তখন উপস্থিত জনতা তা দেখে ভীত হয় এবং অপরাধ থেকে দূরে থাকে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"

(খ) পাপ মোচন বা পবিত্রতা (الجوابر): যদিও হানাফি মাযহাবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো হদ মূলত দুনিয়াবি শাস্তি ও প্রতিরোধের জন্য, তবে এর একটি আধ্যাত্মিক দিকও রয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার অপরাধের শাস্তি পেয়ে গেল, আল্লাহ তাকে পরকালে পুনরায় শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন।" অর্থাৎ, হদ কার্যকর হলে তা অপরাধীর পাপ মোচনের কারণ (কাফফারা) হতে পারে, যদি সে তওবা করে।

(গ) মাকাসিদে শরীয়াহ বা শরীয়তের মৌলিক লক্ষ্য রক্ষা: ইসলামী আইনের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ (জরুরিয়াতে খামসা) রক্ষার জন্য হুদুদ অপরিহার্য:

- **দ্বীন রক্ষা:** ধর্মত্যাগী বা মুরতাদের শাস্তির মাধ্যমে দ্বীনের নিরাপত্তা বিধান করা হয়।

- **জীবন রক্ষা (হিফজুন নফস):** কিসাস ও হুদুদের ভয়ে মানুষ হত্যা ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন, "হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"

- **বংশ রক্ষা (হিফজুন নাসল):** যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি (রজম বা বেত্রাঘাত) বংশের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং অবৈধ সন্তানের আধিক্য রোধ করে।

- **বুদ্ধিমত্তা রক্ষা (হিফজুল আকল):** মদ্যপানের শাস্তি (৮০ বেত্রাঘাত) মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও বিবেককে সুরক্ষা দেয়।

- **সম্পদ রক্ষা (হিফজুল মাল):** চুরির শাস্তি (হাত কাটা) বা ডাকাতির শাস্তির মাধ্যমে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

(ঘ) সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা: হুদুদের বিধান না থাকলে সমাজে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি কায়েম হতো। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, হুদুদ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। কঠোর শাস্তির বিধান থাকায় মানুষ অপরাধ করার আগে শতবার ভাবে, ফলে সমাজে শান্তি বজায় থাকে।

(ঙ) আল্লাহর হক আদায়: হুদুদ যেহেতু 'হাক্কুল্লাহ', তাই এটি বাস্তবায়ন করা মানে জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা। বিচারক বা শাসকের জন্য হদ কার্যকর করা ইবাদততুল্য দায়িত্ব।

৪. হুদুদ বাস্তবায়নের সতর্কতা: হানাফি ফিকহের একটি মূলনীতি হলো— **"الحدود تدرأ بالشبهات"** (সন্দেহ বা সংশয় দেখা দিলে হদ বাতিল হয়ে যায়)। অর্থাৎ, হদ কার্যকর করার উদ্দেশ্য কেবল শাস্তি দেওয়া নয়, বরং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সামান্যতম সন্দেহ থাকলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় না, বরং লঘু শাস্তির দিকে যাওয়া হয়। এটি ইসলামী আইনের মানবিক দিক।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, হদ বা হুদুদ ইসলামী দণ্ডবিধির মেরুদণ্ড। এর সংজ্ঞা ও প্রয়োগপদ্ধতি প্রমাণ করে যে, এটি কোনো প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নয়, বরং একটি সংশোধনমূলক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, হুদুদের মূল লক্ষ্য হলো সমাজকে কলুষমুক্ত করা এবং মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'সহ অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থে বর্ণিত এই বিধানগুলো ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-২২: যিনার (অবৈধ যৌনতা) হদ (শাস্তি) কার্যকর করার শর্তাবলি কী কী? এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় এর প্রমাণের দলিলগুলো কী?

(ما هي شروط إقامة حد الزنا؟ وما هي أدلة ثبوته في القضاء الإسلامي؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে যিনা বা ব্যভিচারকে জঘন্যতম অপরাধ ও অশ্লীলতা (ফাহিশা) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটি কেবল ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং পারিবারিক কাঠামো ধ্বংসকারী এবং বংশের পবিত্রতা নষ্টকারী এক সামাজিক ব্যাধি। এই অপরাধের শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর—অবিবাহিতের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিতের জন্য রজম (পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড)। শাস্তির এই কঠোরতার কারণেই হানাফি ফিকহে এই শাস্তি কার্যকর করার শর্তাবলি অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামে কাউকে যিনার শাস্তি দেওয়া হয় না।

২. যিনার হদ কার্যকর করার শর্তাবলি (شروط إقامة حد الزنا): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের আলোকে যিনার হদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি ক্ষেত্রের শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক: অপরাধী (যানি), কর্ম (যিনা) এবং স্থান।

(ক) অপরাধীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলি: যিনাকারীর ওপর হদ প্রয়োগের জন্য তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী হতে হবে:

- **আক্কেল ও বালেগ হওয়া:** অপরাধীকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকিল) এবং প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হতে হবে। পাগল বা শিশুর ওপর যিনার হদ নেই।
- **মুসলিম হওয়া:** হানাফি মাযহাব মতে, যিনার পূর্ণাঙ্গ শাস্তি (বিশেষ করে ইহসান বা রজম) কার্যকর হওয়ার জন্য অপরাধীকে মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে লঘু শাস্তি হতে পারে।
- **স্বেচ্ছায় কর্ম সম্পাদন (ইখতিয়ার):** বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তির শিকার হয়ে যিনা করলে হদ হবে না। অপরাধীকে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় এ কাজ করতে হবে।

- **বোবা না হওয়া:** হানাফি মতে, বোবা ব্যক্তির ওপর যিনার হদ কার্যকর হয় না, কারণ তার ইশারা অনেক সময় সন্দেহের সৃষ্টি করে, আর সন্দেহের কারণে হদ বাতিল হয়ে যায়।

(খ) যিনার কর্ম বা কাজের শর্তাবলি:

- **প্রকৃত যৌন মিলন:** পুরুষের যৌনাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করতে হবে। কেবল স্পর্শ করা, চুম্বন বা আলিঙ্গন করা যিনা হিসেবে গণ্য হলেও এর জন্য 'হদ' নেই, বরং তাযীর (লঘু শাস্তি) হবে।

- **হারাম সম্পর্ক:** নারীটি অপরাধীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম হতে হবে। যদি নিজের স্ত্রী বা দাসীর সাথে (সন্দেহবশত) মিলন ঘটে, তবে হদ হবে না।

- **শুভাহ বা সন্দেহের অনুপস্থিতি:** কর্মটিতে মালিকানা বা চুক্তির কোনো সন্দেহ (Shubha) থাকতে পারবে না। যেমন—নিকাহে ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ) বা ভুলবশত অন্যের বিছানায় যাওয়ার ঘটনা থাকলে হদ মাফ হয়ে যাবে।

(গ) স্থানের শর্ত:

- **দারুল ইসলাম:** হদ কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে (দারুল ইসলাম) কার্যকর হয়। শত্রু রাষ্ট্রে (দারুল হারব) থাকাকালীন কোনো অপরাধের বিচার ইসলামী আদালতে হদ হিসেবে কার্যকর করা জটিল।

৩. ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় যিনা প্রমাণের দলিল বা পদ্ধতি (أدلة ثبوت الزنا):
ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় যিনা প্রমাণ করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এটি কেবল দুটি উপায়ে প্রমাণিত হতে পারে:

(১) সাক্ষ্য প্রমাণ (الشهادة বা البيّنة): যিনা প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে:

- **চারজন পুরুষ সাক্ষী:** কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, অবশ্যই চারজন পুরুষ সাক্ষীকে উপস্থিত হতে হবে। নারী সাক্ষীর সাক্ষ্য যিনার ক্ষেত্রে হদ প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

- **চাক্ষুষ দর্শন:** সাক্ষীদের অবশ্যই বলতে হবে যে, তারা সুরমাদানি যেমন সুরমাদানির ভেতরে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনিভাবে অপরাধ সংঘটিত হতে 'স্বচক্ষে' দেখেছেন। কেবল এক বিছানায় দেখা বা লেপের নিচে দেখা যথেষ্ট নয়।

- **একই বৈঠকে সাক্ষ্যদান:** চারজন সাক্ষীকে একই বিচারিক মজলিসে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। যদি তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

- **সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণতা (আদালত):** সাক্ষীদের অবশ্যই সত্যবাদী ও পরহেজগার হতে হবে। তাদের পূর্বে কোনো মিথ্যা অপবাদের রেকর্ড থাকা যাবে না।

- **অপবাদের শাস্তি:** যদি চারজন সাক্ষী পূর্ণ না হয় (যেমন ৩ জন এল), অথবা সাক্ষীদের কথায় গরমিল পাওয়া যায়, তবে যিনা তো প্রমাণ হবেই না, উল্টো ঐ সাক্ষীদের 'ক্বাজফ' বা অপবাদের শাস্তি হিসেবে ৮০ বেত্রাঘাত করা হবে।

(২) স্বীকারোক্তি (الإقرار): অপরাধী যদি নিজে বিচারকের সামনে এসে অপরাধ স্বীকার করে, তবে হদ কার্যকর হবে। হানাফি ফিকহে স্বীকারোক্তির জন্য বিশেষ শর্ত রয়েছে:

- **চারবার স্বীকারোক্তি:** অপরাধীকে ভিন্ন ভিন্ন চারটি বিচারিক বৈঠকে (মজলিসে) চারবার স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে যে, "আমি যিনা করেছি"। একবার স্বীকার করা যথেষ্ট নয়।

- **বিচারকের যাচাই:** বিচারক তাকে বারবার ফিরিয়ে দেবেন এবং বলবেন, "হয়তো তুমি কেবল স্পর্শ করেছ", "হয়তো তুমি স্বপ্ন দেখেছ"। বিচারকের দায়িত্ব হলো তাকে স্বীকারোক্তি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

- **প্রত্যাহার করার সুযোগ:** হদ কার্যকর করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত, এমনকি শাস্তি চলাকালীন সময়েও যদি অপরাধী তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় এবং দৌড়ে পালিয়ে যায়, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হানাফি মতে, স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের কারণে হদ বাতিল হয়ে যায়।

(৩) গর্ভধারণ (الحمل) - একটি বিতর্কিত দলিল: কেবল গর্ভধারণ করলেই যিনা প্রমাণিত হয় না, যদি না নারীটি স্বীকার করে অথবা সাক্ষী থাকে। কারণ, গর্ভধারণের ক্ষেত্রে ধর্ষণ বা সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। আর 'সন্দেহ হদকে বাতিল করে দেয়'।

৪. 'ইহসান' বা বিবাহিত হওয়ার শর্ত ও শাস্তির ভিন্নতা: যিনার শাস্তি নির্ধারণের জন্য অপরাধী 'মুহসান' (বিবাহিত) কি না তা দেখা জরুরি। হানাফি মতে 'ইহসান'-এর শর্ত হলো:

- স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম ও বিবেকবান হওয়া।
- পূর্বে একবার হলেও বৈধ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মিলন সংঘটিত হওয়া। এই গুণগুলো থাকলে তাকে 'রজম' (মৃত্যুদণ্ড) দেওয়া হবে। আর এগুলো না থাকলে (অর্থাৎ অবিবাহিত হলে) ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে।

৫. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, ইসলাম যিনাকে কঠোরভাবে দমন করতে চায়, কিন্তু শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে। চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী বা চারবার স্বীকারোক্তির শর্ত প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানুষের দোষ গোপন রাখতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু যখন অপরাধ প্রকাশ্যে চলে আসে বা অপরাধী নিজে পবিত্র হতে চায়, কেবল তখনই হানাফি ফিকহের এই কঠোর দণ্ডবিধি কার্যকর হয়। এটি সমাজকে অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করার এক চূড়ান্ত আইনি দেওয়াল।

প্রশ্ন-২৩: অপবাদের হদ (হদ্দুল কাজফ) সম্পর্কে আলোচনা কর। এটি ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী এবং কীভাবে এ শাস্তি বাতিল হতে পারে?
تحدث عن حد القذف (قذف المحصن)، وما هي شروط وجوبه وكيف يسقط هذا الحد؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে মানুষের ইজ্জত বা সম্মানের মর্যাদা তার রক্তের মর্যাদার সমান। কোনো নিরপরাধ সতী-সাধ্বী নারী বা পুরুষের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করাকে ইসলাম 'কবিরা গুনাহ' এবং জঘন্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'ক্বাজফ' (القذف) বলা হয়। পবিত্র কুরআনে সূরা নূরে এই অপরাধের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। 'আল-

ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে ক্বাজফের বিস্তারিত বিধান, শর্ত এবং শাস্তি রহিত হওয়ার কারণগুলো আলোচিত হয়েছে।

২. ক্বাজফ বা অপবাদের সংজ্ঞা (تعريف القذف):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ক্বাজফ' অর্থ নিক্ষেপ করা বা ছুঁড়ে মারা। যেহেতু অপবাদকারী তার কথার মাধ্যমে অন্যের দিকে অপবাদ ছুঁড়ে মারে, তাই একে ক্বাজফ বলা হয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহ মতে— *"কোনো সতী-সাধ্বী ও বিবাহিত নারী বা পুরুষকে যিনার অপবাদ দেওয়া অথবা কারো বংশ বা নসবকে অস্বীকার করাকে ক্বাজফ বলে।"* যেমন কাউকে বলা, "হে ব্যভিচারী!" বা "হে বেশ্যা!" (নাউজুবিল্লাহ)।

৩. ক্বাজফের শাস্তি (حد القذف): কুরআন মজিদের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রমাণিত অপবাদকারীর শাস্তি হলো: **১. ৮০টি বেত্রাঘাত:** তাকে প্রকাশ্যে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত করা হবে। ২. **সাক্ষ্য গ্রহণ না করা:** সে চিরস্থায়ীভাবে অযোগ্য ঘোষিত হবে, তার সাক্ষ্য আর কখনো আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না। ৩. **ফাসিক হওয়া:** সে আল্লাহর কাছে ফাসিক বা পাপাচারী হিসেবে গণ্য হবে (তওবা না করা পর্যন্ত)।

৪. ক্বাজফের হদ ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط وجوب الحد): অপবাদ দিলেই হদ কার্যকর হয় না, বরং হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর জন্য অপবাদকারী এবং যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হয়েছে (মাকজুফ)—উভয়ের মধ্যে কিছু শর্ত থাকতে হবে।

(ক) অপবাদকারীর (ক্বাজিফ) শর্ত:

- **প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান:** অপবাদকারীকে বালেগ ও আকিল হতে হবে। পাগল বা শিশুর কথায় হদ নেই।

- **স্বেচ্ছায় বলা:** জবরদস্তির শিকার হয়ে অপবাদ দিলে শাস্তি হবে না।

- **হদ না হওয়া:** যদি অপবাদকারী তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে (অর্থাৎ ৪ জন সাক্ষী আনতে পারে), তবে তার ওপর ক্বাজফের হদ হবে না, বরং যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার ওপর যিনার হদ জারি হবে।

(খ) অপবাদকৃত ব্যক্তির (মাকজুফ) শর্ত - ইহসান: যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তাকে অবশ্যই 'মুহসান' বা সতীত্বের অধিকারী হতে হবে। হানাফি মতে, ক্বাজফের ক্ষেত্রে 'ইহসান'-এর শর্ত পাঁচটি: ১. **মুসলিম হওয়া:** অমুসলিমকে অপবাদ দিলে হদ নেই, তাযীর আছে। ২. **প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া:** শিশুকে অপবাদ দিলে হদ নেই। ৩. **বিবেকবান হওয়া:** পাগলকে অপবাদ দিলে হদ নেই। ৪. **স্বাধীন হওয়া:** দাস-দাসীকে অপবাদ দিলে হদ নেই। ৫. **সতীত্ব (ইফফাত):** অর্থাৎ, সে পূর্বে কখনো যিনার সাথে জড়িত ছিল না। যদি এমন কাউকে অপবাদ দেওয়া হয় যার পূর্বে যিনার রেকর্ড আছে বা সমাজে যার চরিত্র খারাপ বলে প্রসিদ্ধ, তবে অপবাদকারীর ওপর 'হদ' (৮০ বেত্রাঘাত) আসবে না, বরং 'তাযীর' (লঘু শাস্তি) হবে।

(গ) অপবাদের ভাষার শর্ত: অপবাদটি স্পষ্ট ভাষায় যিনার অভিযোগ হতে হবে। অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথা বললে হদ হবে না, তাযীর হতে পারে।

৫. ক্বাজফের হদ বাতিল বা রহিত হওয়ার কারণসমূহ (مسقطات حد القذف): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, হদ ওয়াজিব হওয়ার পরেও কিছু বিশেষ কারণে তা বাতিল বা 'সাক্বিত' হয়ে যেতে পারে:

(১) প্রমাণের উপস্থিতি (إقامة البينة): অপবাদকারী যদি তার দাবির পক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী হাজির করতে পারে, তবে তার ওপর থেকে ক্বাজফের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং উল্টো অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর যিনার শাস্তি কার্যকর হবে।

(২) লিআন (اللعان): যদি স্বামী তার স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দেয় এবং সাক্ষী আনতে না পারে, তবে হানাফি মতে স্বামীর ওপর ৮০ বেত্রাঘাত আসবে না। এর পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে 'লিআন'-এর বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ, উভয়ে আল্লাহর নামে চারটি কসম খাবে এবং একে অপরের ওপর লানত দেবে। এরপর বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।

(৩) অভিযোগ প্রত্যাহার বা ক্ষমা (العفو) - একটি বিতর্কিত বিষয়:

- **হানাফি মাযহাব:** হানাফিদের মতে, ক্বাজফের হদ মূলত **'হাক্কুল্লাহ'** (আল্লাহর হক), তবে এতে বান্দার হকেরও সংমিশ্রণ আছে। যেহেতু এতে আল্লাহর হক প্রবল, তাই মামলা বিচারকের কাছে পৌঁছানোর পর বাদী (যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে) ক্ষমা করে দিলেও হদ মাফ হয় না। বিচারক শাস্তি কার্যকর করবেন।

- তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে এটি বিশুদ্ধ বান্দার হক, তাই বাদী ক্ষমা করলে শাস্তি মাফ হয়ে যায়।

(৪) সত্যতা স্বীকার (تصديق المقذوف): যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে যদি আদালতে দাঁড়িয়ে বলে, "হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে, আমি যিনা করেছি", তবে অপবাদকারীর শাস্তি মাফ হয়ে যাবে।

(৫) অভিযুক্তের মৃত্যু (موت المقذوف) - হানাফি মত: হানাফি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মত হলো, মামলা চলাকালীন বা রায় কার্যকর হওয়ার আগে যদি অপবাদকৃত ব্যক্তি (বাদী) মারা যায়, তবে তার ওয়ারিশরা এই হদ দাবি করতে পারে না। কারণ, এটি 'ইজ্জত' বা সম্মানের বিষয়, যা উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানান্তরিত হয় না। ফলে অভিযুক্তের মৃত্যুতে হদ বাতিল হয়ে যায়। (অন্যান্য মাযহাবে ওয়ারিশরা দাবি করতে পারে)।

৬. উপসংহার (خاتمة): ক্বাজফ বা অপবাদের শাস্তি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি রক্ষাকবচ। এটি মানুষের বাক-স্বাধীনতা হরণ করে না, বরং বাক-সংযম শিক্ষা দেয়। হানাফি ফিকহে এই বিধানের শর্তাবলি অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে কেউ রাগের বশবর্তী হয়ে অন্যের সম্মানহানি করতে না পারে। আবার 'সন্দেহ' বা প্রমাণের অভাবে শাস্তি রহিত হওয়ার বিধান বিচার ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে এই শাস্তি কার্যকর হলে সমাজে গীবত, অপবাদ ও চরিত্র হননের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

السرقة : (চুরি) - নির্ধারিত পাঠ

প্রশ্ন-২৪: হানাফী ফিকহে যে চুরির জন্য হাত কাটা ওয়াজিব হয়, তার সংজ্ঞা দাও। চুরি হওয়া বস্তুর মধ্যে কোন্ শর্তগুলো থাকা আবশ্যক?

(عرف "السرقة" التي توجب القطع في الفقه الحنفي - وما هي الشروط التي يجب توافرها في المال المسروق؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়ত মানুষের জান-মাল, ইজ্জত ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করেছে। সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করা শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়াহ)। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য পদ্ধতি হলো 'চুরি' বা 'সারি কাহ'। চুরির অপরাধ দমনের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে হাত কাটার মতো কঠোর শাস্তি বা 'হদ' নির্ধারণ করেছেন। তবে সব ধরনের চুরিতে হাত কাটা হয় না। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও শর্তাবলি আলোচিত হয়েছে।

২. চুরির পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف السرقة): 'আস-সারি কাহ' (السرقة) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** 'সারি কাহ' শব্দের অর্থ হলো গোপনে কোনো কিছু নেওয়া বা হরণ করা। আরবিতে বলা হয়, 'সরাকাস সামউ' (সে গোপনে কথা শুনে নিল)।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে হিদায়া ও সিরাজিয়াহ গ্রন্থের আলোকে যে চুরির কারণে হাত কাটা ওয়াজিব হয়, তার সংজ্ঞা হলো: "**أَخْذُ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ نِصَابًا مُحْرَزًا، مِلْكًا لِلْغَيْرِ، خُفْيَةً**" অর্থ: *"কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তির অপর কারো সংরক্ষিত (তত্ত্বাবধানে থাকা) ও নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব) মাল গোপনে হরণ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় সারি কাহ বা চুরি বলে।"*

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. গোপনে গ্রহণ (খুফিয়া): কাজটি গোপনে হতে হবে। প্রকাশ্যে ছিনতাই বা ডাকাতি চুরির সংজ্ঞায় পড়ে না, তা ভিন্ন অপরাধ। ২. **সংরক্ষিত স্থান (হিরয):** মালটি অবশ্যই নিরাপদ বা তালাবদ্ধ স্থানে থাকতে হবে। ৩. **মালিকানা:** মালটি অবশ্যই অন্যের হতে হবে। নিজের মালে চুরি হয় না।

৩. চুরি হওয়া বস্তুর শর্তাবলি (شروط المال المسروق): যেকোনো কিছু চুরি করলেই চোরের হাত কাটা হয় না। হাত কাটার হদ বা শাস্তি কার্যকর হওয়ার জন্য চুরি হওয়া মাল বা বস্তুর মধ্যে ১০টি বিশেষ শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। হানাফি ফিকহের আলোকে শর্তগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(ক) মালের প্রকৃতিগত শর্ত:

- **১. মাল মুতাকাওউইম (مال متقوم) হওয়া:** বস্তুটি এমন হতে হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ হিসেবে গণ্য এবং যার ব্যবহার বৈধ। যেমন—মদ বা শুকর চুরি করলে হাত কাটা যাবে না, কারণ মুসলমানের জন্য এগুলো 'মাল' বা সম্পদ নয়।

- **২. মালে মাহফুজ (مال محفوظ) হওয়া:** বস্তুটি সংরক্ষিত হতে হবে। এমন বস্তু যা সাধারণত সংরক্ষণ করা হয় না বা রাস্তায় পড়ে থাকে (যেমন কাঠ, খড়, বা বনের পাখি), তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

- **৩. পচনশীল না হওয়া:** হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, দ্রুত পচনশীল দ্রব্য (যেমন—ফলমূল, দুধ, মাছ, মাংস) চুরি করলে হাত কাটা হয় না। কারণ, এগুলো দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ হিসেবে জমা রাখা হয় না এবং এগুলোর প্রতি মানুষের লোভ কম থাকে। তবে বর্তমানে প্যাকেটজাত ও সংরক্ষিত খাদ্যের ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন হতে পারে।

(খ) পরিমাণগত শর্ত:

- **৪. নিসাবে পৌঁছানো:** চুরি হওয়া মালের মূল্য অবশ্যই শরীয়ত নির্ধারিত সর্বনিম্ন পরিমাণ বা 'নিসাব'-এ পৌঁছাতে হবে। সামান্য সুতা বা চকলেট চুরি করলে হাত কাটা হবে না। (নিসাবের পরিমাণ পরবর্তী প্রশ্নে আলোচিত হবে)।

(গ) মালিকানা ও অধিকারের শর্ত:

- **৫. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা (Milk Tam):** বস্তুটি অবশ্যই চোরের মালিকানা থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি চুরি করা বস্তুতে চোরের আংশিক মালিকানা বা অংশীদারিত্ব থাকে (যেমন—বায়তুল মালের সম্পদ বা যৌথ ব্যবসার টাকা), তবে সন্দেহের কারণে হাত কাটা যাবে না।

- **৬. সন্দেহের অবকাশ না থাকা (Shubha):** চোরের যদি মনে করার অবকাশ থাকে যে, এই মালের ওপর তার হক আছে, তবে হাত কাটা হবে না।

(ঘ) স্থানের শর্ত:

- **৭. হিরয বা সংরক্ষিত স্থান:** মালটি অবশ্যই 'হিরয' থেকে চুরি হতে হবে। 'হিরয' দুই প্রকার:
    - **হিরয বিল মাকান:** নিরাপদ স্থান, যেমন—তালাবদ্ধ ঘর, সিন্দুক বা দোকান।
    - **হিরয বিল হাফিজ:** পাহারাদার দ্বারা সংরক্ষিত স্থান। মসজিদ বা সাধারণ পাবলিক প্লেস থেকে জুতা বা মোবাইল চুরি হলে হাত কাটা কঠিন, যদি না তা কোনো নিরাপদ লকার বা পকেটের ভেতর থেকে নেওয়া হয়।

(ঙ) অন্যান্য শর্ত:

- **৮. পবিত্রতা:** বস্তুটি নাপাক বা তুচ্ছ হওয়া যাবে না।
- **৯. রাষ্ট্রের সম্পদ না হওয়া:** হানাফি মতে, সরকারি সম্পদ (গনিমত বা বায়তুল মাল) চুরি করলে হাত কাটা হয় না, কারণ সেখানে চোরেরও একটি প্রচ্ছন্ন অধিকার (হক) থাকে।
- **১০. কুরআন-হাদিসের কপি:** কুরআন মজিদ বা ধর্মীয় কিতাব চুরি করলে হাত কাটা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এগুলো বিক্রির উদ্দেশ্য নয় বরং পড়ার জন্য, তাই এর চুরিতে হাত কাটা নেই।

৪. হুকুম বা শাস্তি: উপর্যুক্ত শর্তগুলো পূরণ হলে বিচারক চোরের ডান হাত কবজি থেকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেবেন। এটি আল্লাহর হক। আল্লাহ তাআলা বলেন: *"পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও।"* (সূরা মায়েদা: ৩৮)।

৫. উপসংহার (خاتمة): চুরির শাস্তি ইসলামে অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু তা প্রয়োগের শর্তগুলোও অত্যন্ত কঠিন। চুরি হওয়া বস্তুর প্রকৃতি, মূল্যমান এবং সংরক্ষণের

ব্যবস্থা—সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার পরই কেবল হাত কাটার রায় দেওয়া হয়। এই শর্তগুলোর উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান থেকে বিরত থাকা। হানাফি ফিকহে মাল ও সম্পদের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এক অনন্য আইনি কাঠামোর পরিচয় দেয়।

প্রশ্ন-২৫: চুরির হদ (শাস্তি) কার্যকরের জন্য গ্রহণযোগ্য 'নিসাব' (নির্দিষ্ট পরিমাণ) কী? এবং বিচার ব্যবস্থায় চুরি কীভাবে প্রমাণিত হয়?

(ما هو "النصاب" المعتبر لإقامة حد السرقة؟ وكيف يتم إثبات السرقة في القضاء؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী দণ্ডবিধিতে লঘু অপরাধ এবং গুরুতর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। চুরির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। ছিঁচকে চুরি আর বড় ধরনের চুরির শাস্তি এক হতে পারে না। তাই হাত কাটার মতো চূড়ান্ত শাস্তি (হদ) প্রয়োগের জন্য চুরি হওয়া সম্পদের একটি সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, যাকে ফিকহের পরিভাষায় 'নিসাব' বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই নিসাব এবং আদালতে চুরি প্রমাণের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. চুরির নিসাব (نصاب السرقة): নিসাব অর্থ হলো সর্বনিম্ন পরিমাণ বা সীমা। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যে পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা ওয়াজিব হয়, তা হলো— **১০ দিরহাম**।

- **পরিমাণ বিশ্লেষণ:**
    - **রৌপ্য মুদ্রা:** ১০ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা)।
    - **স্বর্ণ মুদ্রা:** ১ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা)।
    - **অন্যান্য দ্রব্য:** যদি টাকা বা সোনা-রুপা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু (যেমন মোবাইল, কাপড়) চুরি হয়, তবে দেখতে হবে তার বাজারমূল্য ১০ দিরহামের সমপরিমাণ হয় কি না। যদি ১০ দিরহামের কম হয়, তবে হাত কাটা হবে না, বরং 'তাযীর' বা অন্য লঘু শাস্তি হবে।

- **দলিল (الدليل):** হানাফি মাযহাবের এই মতের স্বপক্ষে দলিল হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস: **"لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"** অর্থ: *"দশ দিরহামের কম মাল চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা নেই।"* (মুসনাদে আহমদ)।

- **অন্যান্য মাযহাবের সাথে পার্থক্য:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও জুমহুর ফকীহদের মতে চুরির নিসাব হলো এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ (১/৪ দিনার) বা ৩ দিরহাম। তবে হানাফি ফকীহগণ সতর্কতা অবলম্বন করে সর্বোচ্চ পরিমাণটি (১০ দিরহাম) গ্রহণ করেছেন, কারণ 'সন্দেহ হদকে রহিত করে'।

৩. বিচার ব্যবস্থায় চুরি প্রমাণের পদ্ধতি (كيفية إثبات السرقة): ইসলামী আদালতে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলেই তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না। বরং বিচারকের সামনে সুনির্দিষ্ট পন্থায় অপরাধ প্রমাণিত হতে হয়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী চুরি প্রমাণের পদ্ধতি দুটি:

(ক) সাক্ষ্য প্রমাণ (الشهادة বা البيّنة): সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে চুরি প্রমাণ করা যায়। এর জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো জরুরি:

- **সাক্ষীর সংখ্যা ও লিঙ্গ:** দুইজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। হানাফি মাযহাব মতে, হদ বা শাস্তির ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য দ্বারা চুরির হদ সাব্যস্ত হবে না (তবে মালের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হতে পারে)।

- **সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু:** সাক্ষীদের স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, "আমরা এই ব্যক্তিকে অমুক জায়গা থেকে, অমুক সম্পদ, গোপনে নিতে দেখেছি।" অর্থাৎ চুরির স্থান, সময় ও মালের বিবরণ স্পষ্ট হতে হবে।

- **চাক্ষুষ দর্শন:** অনুমান বা শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে চলবে না। সাক্ষীদের স্বচক্ষে চুরির ঘটনাটি দেখতে হবে।

- **দেরি না করা:** চুরির ঘটনার পর সাক্ষীরা যদি দীর্ঘ সময় (এক মাস বা তার বেশি) চুপ থাকে এবং পরে সাক্ষ্য দিতে আসে, তবে হানাফি মতে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এই বিলম্ব বিদ্বেষ বা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করতে পারে।

(খ) স্বীকারোক্তি (الإقرار): অপরাধী যদি নিজেই বিচারকের সামনে তার অপরাধ স্বীকার করে নেয়, তবে চুরি প্রমাণিত হবে।

- **শর্তাবলি:** ১. স্বীকারকারীকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। ২. কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি বা ভয়ভীতি ছাড়া স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে হবে। ৩. স্বীকারোক্তিটি একবার স্পষ্ট ভাষায় করলেই যথেষ্ট (ইমাম আবু হানিফার মতে)। তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে দুইবার স্বীকার করা প্রয়োজন।

- **স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার:** হানাফি ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো, হদ কার্যকর করার আগে বা মাঝপথে যদি চোর তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় (বলে যে, "আমি চুরি করিনি, আমি মিথ্যা বলেছিলাম"), তবে তার হাত কাটা হবে না। কিন্তু চুরি হওয়া মাল ফেরত দেওয়ার দায় (Daman) তার ওপর বহাল থাকবে।

(গ) কসম বা শপথ (اليمين): চুরির হদ বা হাত কাটার ক্ষেত্রে বিবাদীকে কসম দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, বাদী যদি সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হয়, তবে বিবাদীকে (অভিযুক্ত চোরকে) এই কসম দেওয়া হবে না যে, "কসম খাও তুমি চুরি করোনি, নতুবা হাত কাটা হবে।" কারণ, কসমের মাধ্যমে 'হদ' সাব্যস্ত হয় না। তবে মালের ক্ষতিপূরণের জন্য কসম প্রযোজ্য হতে পারে।

৪. বিচারকের দায়িত্ব: চুরি প্রমাণিত হওয়ার পর বিচারক চোরকে তওবা করার সুযোগ দেবেন এবং রায় ঘোষণা করবেন। রায় কার্যকর করার সময় বিচারক ও সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা উত্তম।

৫. উপসংহার (خاتمة): চুরির শাস্তি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় এটি প্রমাণের ক্ষেত্রে ইসলাম সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ১০ দিরহামের নিসাব নির্ধারণ করে তুচ্ছ চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আবার সাক্ষী ও স্বীকারোক্তির কঠোর শর্তারোপ করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্ষা করা হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র এই বিধানগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কেবল শাস্তিদাতা নয়, বরং ন্যায়বিচারক।

প্রশ্ন-২৬: নিকটাত্মীয় বা মূল ব্যক্তির (পিতা-মাতা) ঘরে চুরির বিধান ব্যাখ্যা কর। সর্বাবস্থায় কি চোরের হাত কাটা হবে?
(اشرح أحكام السرقة في بيت القريب أو الأصل - وهل يقطع السارق في كل الأحوال؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহে 'হদ' বা দণ্ডবিধি কার্যকর করার একটি মূলনীতি হলো— **"الحدود تدرأ بالشبهات"** অর্থাৎ, "সন্দেহ বা সংশয় দেখা দিলে হদ বাতিল হয়ে যায়।" চুরির ক্ষেত্রে এই সংশয় বা 'শুবহা' তৈরি হতে পারে চোর ও মালের মালিকের মধ্যকার সম্পর্কের কারণে। বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের পিতা-মাতা, সন্তান বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ঘর থেকে চুরি করে, তখন প্রশ্ন জাগে—এতে কি হাত কাটা হবে? 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে চুরির বিধানে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে।

২. নিকটাত্মীয়ের ঘরে চুরির বিধান: হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, আত্মীয়দের ঘর থেকে চুরি করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাত কাটা হয় না। এর কারণ হলো, আত্মীয়দের ঘরে সাধারণত অবাধ যাতায়াত থাকে এবং একে অপরের মালের ওপর অধিকার বা আবদার থাকে। ফলে 'হিরয' (সুরক্ষিত স্থান) এবং 'মালিকানা'র ক্ষেত্রে একটি 'শুবহা' বা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আত্মীয়তার ধরণ অনুযায়ী বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) উসুল বা মূল ব্যক্তি (পিতা-মাতা ও তদূর্ধ্ব): যদি সন্তান তার পিতা বা মাতার সম্পদ চুরি করে, অথবা পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ চুরি করে, তবে কোনো অবস্থাতেই হাত কাটা হবে না।

- **কারণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ"** (তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার)। এই হাদিস প্রমাণ করে যে, সন্তানের সম্পদে পিতার একটি অধিকার আছে। আবার সন্তানের ভরণপোষণ পিতার দায়িত্বে থাকে। ফলে তাদের একে অপরের মালে হদ প্রয়োগ করার মতো পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছিন্নতা নেই।

- **হুকুম:** হাত কাটা হবে না, তবে সম্পদ ফেরত দিতে হবে এবং বিচারক চাইলে 'তাযীর' বা লঘু শাস্তি দিতে পারেন।

(খ) ফুরু বা শাখা (সন্তান-সন্ততি ও অধস্তন): পিতা যদি সন্তানের বা নাতি-নাতনির ঘর থেকে চুরি করে, তাহলেও হাত কাটা হবে না। যুক্তি ও দলিল উপরের মতোই। আত্মীয়তার এই নিবিড় বন্ধন চুরির সংজ্ঞাকে দুর্বল করে দেয়।

(গ) স্বামী-স্ত্রী (Zoujain): স্বামী যদি স্ত্রীর ঘর থেকে বা স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে চুরি করে, তবে হানাফি মাযহাব মতে তাদের হাত কাটা হবে না।

- **কারণ:** স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ঘরে অবাধ যাতায়াত থাকে। তাদের সম্পদ সাধারণত একই ঘরে বা একই সিন্দুকে রক্ষিত থাকে। ফলে 'হিরয' বা সুরক্ষার শর্তটি এখানে পূর্ণ হয় না। আল্লাহ তাআলা তাদের একে অপরের 'পোশাক' বলেছেন, যা তাদের ঘনিষ্ঠতা ও মালের সংমিশ্রণ নির্দেশ করে।

(ঘ) মাহরাম আত্মীয় (রক্তের সম্পর্কের ভাই-বোন, চাচা-মামা): মাহরাম আত্মীয়দের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ঘর থেকে চুরি করার বিধানের ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে:

- **অবস্থা-১: একত্রে বসবাস:** যদি ভাই ভাইয়ের সাথে বা চাচার সাথে একই পরিবারে থাকে এবং তাদের খাওয়া-দাওয়া বা প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত থাকে, তবে চুরি করলে হাত কাটা হবে না। কারণ এখানেও 'হিরয'-এর শর্ত লঙ্ঘন হয়।

- **অবস্থা-২: আলাদা বসবাস:** যদি তারা সম্পূর্ণ পৃথক বাড়িতে থাকে এবং ঘর তালাবদ্ধ থাকে, আর একজন অন্যজনের তালা ভেঙে চুরি করে, তবে এ ক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদ আছে।

    - **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** তিনি বলেন, মাহরাম আত্মীয়দের ক্ষেত্রে হাত কাটা মাকরূহ বা অনুচিত। কারণ, আত্মীয়তার বন্ধন (সিলাহ রেহেম) একটি সন্দেহের সৃষ্টি করে। আত্মীয় হিসেবে তার ঘরে প্রবেশের হয়তো তার একটি অলিখিত অনুমতি ছিল। তাই তিনি হাত কাটার পক্ষে নন।

    - **সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মত:** তাঁদের মতে, যদি তারা আলাদা থাকে এবং 'হিরয' বা সুরক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়, তবে মাহরাম আত্মীয় হলেও হাত কাটা যাবে। তবে ফতোয়া সাধারণত

ইমাম আবু হানিফার মতের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় যে, মাহরামের মালে হাত কাটা হয় না।

(ঙ) গায়রে মাহরাম আত্মীয় (চাচাতো ভাই, দুলাভাই ইত্যাদি): যাদের সাথে বিবাহ বৈধ এবং যারা রক্তের সম্পর্কের দিক থেকে একটু দূরে, তাদের ঘর থেকে চুরি করলে এবং 'হিরয' বা সুরক্ষার শর্ত পূর্ণ হলে হাত কাটা হবে। কারণ, তাদের মালে চোরের কোনো হক বা প্রবেশের সাধারণ অনুমতি থাকে না।

৩. হাত না কাটার অর্থ কি দায়মুক্তি? এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট থাকা জরুরি। আত্মীয়ের ঘর থেকে চুরি করলে 'হাত কাটা হবে না'—এর অর্থ এই নয় যে কাজটি জায়েয বা চোর নির্দোষ।

- **গুনাহ:** এটি অবশ্যই হারাম ও কবীরা গুনাহ। আত্মীয়তার হক নষ্ট করার কারণে এর পাপ আরও বেশি হতে পারে।
- **শাস্তি:** বিচারক হাত না কাটলেও তাকে জেল, জরিমানা বা বেত্রাঘাতের (তাযীর) মাধ্যমে শাস্তি দেবেন।
- **ক্ষতিপূরণ:** চুরি করা মাল অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

৪. উপসংহার (خاتمة): ইসলামী শরীয়ত পারিবারিক বন্ধন ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে দেখা যায়, পিতা-মাতা, সন্তান বা মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে 'ইনবিসাত' (খোলামেলা সম্পর্ক) থাকার কারণে চুরির কঠোরতম শাস্তি 'হদ' রহিত হয়ে যায়। এটি চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, বরং এটি শরীয়তের 'সন্দেহের কারণে হদ বাতিল করার' মূলনীতির বাস্তবায়ন। তবে অপরাধীকে অবশ্যই অন্যভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

الكراهية والاستحسان : মাকরূহ ও ইসতিহসান

প্রশ্ন-২৭: হানাফী ফিকহে মাকরূহ এর প্রকারভেদ (তাহরীমি ও তানযিহি)-এর সংজ্ঞা দাও। সিরাজিয়াহ থেকে প্রতিটি প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।
عرف أقسام الكراهة (التحريمية والتنزيهية) في الفقه الحنفي - واذكر مثالا لكل قسم من السراجية.)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান বা 'আহকাম' কেবল হালাল ও হারামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এমন অনেক কাজ রয়েছে যা সরাসরি হারাম নয়, আবার পুরোপুরি প্রশংসনীয়ও নয়। ফিকহী পরিভাষায় এগুলোকে 'মাকরূহ' বলা হয়। বিশেষ করে হানাফি মাযহাবে মাকরূহ-এর আলোচনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল কারাহিয়্যাহ' (অপছন্দনীয় বিষয়) অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। মুফতি ও ফকীহদের জন্য হারামের পাশাপাশি মাকরূহ-এর স্তরগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি।

২. মাকরূহ-এর পরিচয় (تعريف الكراهة):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'কারাহিয়্যাহ' বা 'মাকরূহ' শব্দটি আরবি 'কারহুন' (كره) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—অপছন্দ করা, ঘৃণা করা, মন্দ মনে করা বা অনাকাঙ্ক্ষিত হওয়া। যা মানুষ স্বভাবগতভাবে বা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দ করে, তাই মাকরূহ।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ফিকহী পরিভাষায় মাকরূহ বলা হয়— *"এমন কাজ যা পালন করার চেয়ে পরিহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম বা যা করলে গুনাহ হতে পারে (স্তরের ভিন্নতা সাপেক্ষে), কিন্তু তা হারামের মতো অকাট্য দলিলে প্রমাণিত নয়।"*

৩. হানাফী মাযহাবে মাকরূহ-এর প্রকারভেদ (أقسام الكراهة عند الحنفية): অন্যান্য মাযহাবের (যেমন শাফেয়ী) সাথে হানাফিদের একটি বড় পার্থক্য হলো, হানাফী ফকীহগণ মাকরূহকে হারামের কাছাকাছি একটি শক্তিশালী অবস্থানে রাখেন। হানাফি ফিকহে মাকরূহ প্রধানত **দুই প্রকার:** ক. মাকরূহ তাহরীমি (المكروه التحريمي)। খ. মাকরূহ তানযিহি (المكروه التنزيهي)।

নিচে প্রতিটি প্রকারের বিস্তারিত সংজ্ঞা ও বিধান আলোচনা করা হলো:

(ক) মাকরূহ তাহরীমি (المكروه التحريمي):

- **সংজ্ঞা:** যে কাজটি বর্জন করার জন্য শরীয়ত প্রবলভাবে বা কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু তার নিষেধাজ্ঞার দলিলটি 'হারাম'-এর মতো অকাট্য (ক্বাতয়ী) নয় বরং ধারণা-প্রসূত (যন্নী), তাকে মাকরূহ তাহরীমি বলে। এটি কার্যত হারামের খুব কাছাকাছি।

- **হুকুম বা বিধান:** ১. এটি করা **ওয়াজিব তরক** করার নামান্তর। অর্থাৎ, এই কাজ করা গুনাহ এবং এর জন্য শাস্তির ভয় রয়েছে। ২. যে ব্যক্তি মাকরূহ তাহরীমিকে হালাল মনে করে, সে কাফের হবে না (যেহেতু দলিল যন্নী), কিন্তু সে বিদআতী বা ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। ৩. ইবাদতের ক্ষেত্রে মাকরূহ তাহরীমি সংঘটিত হলে সেই ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় এবং পুনরায় আদায় করা (ওয়াজিবুল ইদাহ) জরুরি হয়ে পড়ে।

- **উদাহরণ (সিরাজিয়াহ থেকে):** 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-এর পানাহার ও পোশাক অধ্যায় অনুযায়ী, **পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা বা স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ তাহরীমি।** যদিও হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কিন্তু কিছু বিশেষ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে এটি হারামের স্তরের চেয়ে সামান্য নিচে, তবে বর্জন করা আবশ্যক।

(খ) মাকরূহ তানযিহি (المكروه التنزيهي):

- **সংজ্ঞা:** যে কাজটি বর্জন করার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু সেই নির্দেশটি কঠোর বা বাধ্যতামূলক নয়, বরং তা বর্জন করা উত্তম এবং করলে সামান্য অপছন্দনীয় হয়, তাকে মাকরূহ তানযিহি বলে। এটি হালালের কাছাকাছি।

- **হুকুম বা বিধান:** ১. এই কাজ করলে কোনো গুনাহ হয় না এবং শাস্তিও হয় না। ২. তবে এটি বর্জন করলে সওয়াব পাওয়া যায়। কারণ এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পছন্দনীয় আচরণের (আদব) পরিপন্থী। ৩. এটি নিয়মিত করতে থাকলে তা মানুষের দ্বীনি গাম্ভীর্য কমিয়ে দেয়।

- **উদাহরণ (সিরাজিয়াহ থেকে):** ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, **কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খেয়ে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ**

তানযিহি। কারণ এতে অন্য মুসল্লি ও ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। এটি হারাম নয়, কিন্তু পরিহার করা উত্তম শিষ্টাচার।

৪. মাকরূহ তাহরীমি ও তানযিহির পার্থক্য (جدول الفرق): বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি তুলনামূলক ছক নিচে দেওয়া হলো:

বিষয়	মাকরূহ তাহরীমি	মাকরূহ তানযিহি
অবস্থান	হারামের নিকটবর্তী (আকরাবু ইলাল হারাম)।	হালালের নিকটবর্তী (আকরাবু ইলাল হালাল)।
দলিল	যন্নী বা ধারণা-প্রসূত দলিল দ্বারা কঠোর নিষেধাজ্ঞা।	শিষ্টাচার বা উত্তম আচরণের নির্দেশক দলিল।
গুনাহ	করলে গুনাহ হয় এবং শাস্তির যোগ্য হয়।	করলে গুনাহ হয় না, তবে অনুত্তম।
বর্জন	বর্জন করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব।	বর্জন করা মুস্তাহাব বা উত্তম।
অস্বীকারকারী	অস্বীকারকারী ফাসিক বা পথভ্রষ্ট হয়।	অস্বীকারকারী কাফের বা ফাসিক হয় না।
ইবাদতে প্রভাব	নামাজে ঘটলে নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজিব।	নামাজ হয়ে যায়, তবে সওয়াব কমে যায়।

৫. ইমাম মুহাম্মদের বিশেষ মত: হানাফি মাযহাবের অন্যতম ইমাম, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.)-এর মতে, যখন ফিকহী কিতাবে কেবল 'মাকরূহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয় এবং কোনো ব্যাখ্যা থাকে না, তখন তা সাধারণত **'মাকরূহ তাহরীমি'** বা হারামের অর্থেই ধর্তব্য হয়।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, হানাফি ফিকহে মাকরূহ-এর ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—পোশাক, খাদ্য, পানীয় এবং সামাজিক আচরণে কোনটি মাকরূহ তাহরীমি এবং কোনটি তানযিহি, তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। মুমিন বান্দার উচিত উভয় প্রকার মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা, কারণ ছোট ছোট অপছন্দনীয় কাজই মানুষকে ধীরে ধীরে হারামের দিকে নিয়ে যায়। তাকওয়ার দাবি হলো, সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা।

প্রশ্ন-২৮: যে সকল মাসয়ালায় মাকরূহ-এর বিধান আসে, সেখানে ফয়সালার মূলনীতি কী? এবং ফকীহ কীভাবে মাকরূহ ও জায়েযের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন? (ما هي العدة في المسائل التي ترد فيها الكراهة؟ وكيف يوازن الفقيه بين المكروه والجائز؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহে 'কারাহিয়্যাহ' বা মাকরূহ নির্ধারণ করা একটি স্পর্শকাতর ও জটিল বিষয়। এটি হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী একটি স্থান, যেখানে বিচার করার জন্য ফকীহকে গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হয়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কোনো কাজকে ঢালাওভাবে মাকরূহ বা জায়েয বলা যায় না; বরং এর পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট মূলনীতি (উসুল) ও কারণ (ইল্লত) কাজ করে। ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই মূলনীতিগুলো প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন কীভাবে মাকরূহ ও জায়েযের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

২. মাকরূহ সাব্যস্ত করার মূলনীতিসমূহ (قواعد تحديد الكراهة): কোনো কাজ মাকরূহ কি না, তা নির্ধারণের জন্য হানাফি ফকীহগণ নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো অনুসরণ করেন:

(ক) সন্দেহের নীতি (Rule of Doubt): একটি প্রসিদ্ধ ফিকহী কায়দা হলো—**"ما كان سببا للحرام فهو مكروه"** (যা কিছু হারামের কারণ হয় বা হারামের দিকে নিয়ে যায়, তা মাকরূহ)।

- **ব্যাখ্যা:** যদি কোনো কাজ সরাসরি হারাম না হয় কিন্তু তা করলে হারামে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে তা মাকরূহ তাহরীমি হিসেবে গণ্য হবে। যেমন—বেগানা নারীর দিকে অকারণে তাকানো। তাকানো হারাম নয়, কিন্তু এটি যিনার দিকে নিতে পারে বলে মাকরূহ।

(খ) বিজাতীয় সংস্কৃতির সাদৃশ্য (তাশাব্বুহ): রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত।"

- **নীতি:** পোশাক-আশাক বা চালচলনে যদি কাফের বা ফাসিকদের সাথে সাদৃশ্য (তাশাব্বুহ) সৃষ্টি হয়, তবে সেই কাজ মৌলিকভাবে বৈধ হলেও সাদৃশ্যের কারণে তা মাকরূহ হয়ে যায়।

(গ) অপচয় ও অহংকার (ইসরাফ ও তাকাব্বুর): কোনো কাজ বা বস্তু ব্যবহারের উদ্দেশ্য যদি হয় অহংকার প্রদর্শন বা অপচয়, তবে তা মাকরূহ।

- **উদাহরণ:** সোনা-রুপার পাত্র ব্যবহার করা। এটি কেবল ধাতুর কারণে নিষিদ্ধ নয়, বরং এতে অহংকার ও গরিবদের মনে কষ্টের কারণ থাকে বলে মাকরূহ।

(ঘ) ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি: যে কাজ মানুষের ইবাদতে মনোযোগ নষ্ট করে বা মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে, তা মাকরূহ। যেমন—পোশাকে জীবজন্তুর ছবি থাকা বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া।

৩. মাকরূহ ও জায়েযের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা (الموازنة بين المكروه والجائز): একজন মুফতি বা ফকীহ যখন ফাতওয়া দেন, তখন তিনি কেবল নিষেধাজ্ঞার দিকে তাকান না, বরং মানুষের প্রয়োজন (হাজত) ও পরিস্থিতির (জরুরত) দিকেও লক্ষ্য রাখেন। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তাঁর গ্রন্থে মাকরূহ ও জায়েযের ভারসাম্য রক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করেছেন:

(ক) জরুরত বা আবশ্যকতা (الضرورة): ফিকহের একটি মূলনীতি হলো—**"الضرورات تبيح المحظورات"** (প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে)।

- **প্রয়োগ:** রেশমি কাপড় পরা পুরুষদের জন্য মাকরূহ তাহরীমি। কিন্তু যুদ্ধে শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টি করতে বা চর্মরোগের চিকিৎসার জন্য রেশম পরা জায়েয, এমনকি মুস্তাহাব হতে পারে। এখানে ফকীহ 'রোগ নিরাময়'-এর জরুরতকে 'রেশমের নিষেধাজ্ঞা'-এর ওপর প্রাধান্য দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করেন।

(খ) নিয়ত বা উদ্দেশ্য (النية): অনেক কাজ বাহ্যিকভাবে মাকরূহ মনে হলেও নিয়তের কারণে তা জায়েয হতে পারে।

- **উদাহরণ:** ভালো কাপড় পরা। যদি উদ্দেশ্য হয় অহংকার, তবে তা মাকরূহ। আর যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ বা সৌন্দর্য, তবে তা জায়েয ও মুস্তাহাব। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, নিয়তের ভিন্নতায় হুকুম পাল্টে যায়।

(গ) প্রথা বা উরফ (العرف): সমাজের প্রচলিত প্রথা মাকরূহ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। কোনো পোশাক যদি কোনো সমাজে 'অহংকারী পোশাক' হিসেবে গণ্য না হয়, তবে তা পরা মাকরূহ হবে না, যদিও অন্য সমাজে তা মাকরূহ হতে পারে। ফকীহকে স্থানীয় সংস্কৃতির দিকে নজর দিতে হয়।

(ঘ) সামান্য বনাম অধিক (Al-Qaleel wal-Katheer): হানাফি ফিকহে পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে হুকুম বদলায়।

- **উদাহরণ:** পুরুষের জন্য রেশম মাকরূহ, কিন্তু কাপড়ের পাড়ে বা পকেটে সামান্য পরিমাণ (চার আঙ্গুল পরিমাণ) রেশমের ব্যবহার মাকরূহ নয়, বরং জায়েয। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য ফকীহকে করতে হয় যাতে মানুষের জন্য দ্বীন পালন কঠিন না হয়ে পড়ে।

৪. সিরাজিয়াহ গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) কঠোরতা এবং শিথিলতার মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেছেন।

- **খাদ্যদ্রব্য:** তিনি এমন প্রাণীর গোশত খাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন যা নোংরা জিনিস খায় (জালালাহ), কিন্তু যদি প্রাণীটিকে কয়েকদিন আটকে রেখে বিশুদ্ধ খাবার খাওয়ানো হয়, তবে তা জায়েয বলেছেন। এটি ভারসাম্য রক্ষার একটি চমৎকার উদাহরণ।
- **লেনদেন:** তিনি ধোঁকাবাজির আশঙ্কা আছে এমন বিক্রিকে মাকরূহ বলেছেন, কিন্তু যদি সামান্য ধোঁকা (গাবনে ইয়াসির) হয় যা এড়ানো কঠিন, তবে ব্যবসার স্বার্থে তা জায়েয রেখেছেন।

৫. ফকীহের দায়িত্ব: মাকরূহ ও জায়েযের দোলাচলে ফকীহের দায়িত্ব হলো মানুষকে 'তাকওয়া' বা সতর্কতার পথ দেখানো। যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে হানাফি ফিকহের নীতি হলো— **"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"** (সন্দেহজনক বিষয় ছেড়ে যা সন্দেহমুক্ত তার দিকে যাও)। অর্থাৎ, জায়েয হওয়ার শক্তিশালী দলিল না থাকলে মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকাই নিরাপদ।

৬. উপসংহার (خاتمة): মাকরূহ অধ্যায়ের মাসয়ালাগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামী ফিকহ একটি স্থিতিস্থাপক ও বাস্তবসম্মত আইন ব্যবস্থা। ফয়সালার মূলনীতি হিসেবে 'অপচয়', 'অহংকার', 'সাদৃশ্য' এবং 'সন্দেহ'—এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) এবং হানাফি ফকীহগণ প্রয়োজন, নিয়ত এবং পরিস্থিতির আলোকে মাকরূহ ও জায়েযের মধ্যে এক অনন্য ভারসাম্য তৈরি করেছেন, যা মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করার পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির পথও সুগম করে।

প্রশ্ন-২৯: হানাফীদের মতে 'ইসতিহসান' (পছন্দনীয় মত)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এবং তা বৈধ হওয়ার দলিল কী?
(عرف "الاستحسان" لغة واصطلاحا عند الحنفية - وما هو دليل حجيته؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের এক অনন্য ও শক্তিশালী মূলনীতি হলো 'ইস্তিহসান' (الاستحسان)। শরীয়তের বিধানাবলীকে মানুষের জন্য সহজসাধ্য, যৌক্তিক এবং জনকল্যাণমুখী করার ক্ষেত্রে ইস্তিহসানের ভূমিকা অপরিসীম। অনেক সময় প্রকাশ্য কিয়াস (Analogy) প্রয়োগ করলে মাসয়ালায় কঠোরতা বা অসামঞ্জস্য তৈরি হয়, তখন ফকীহগণ গভীর গবেষণার মাধ্যমে এমন একটি রায়ের দিকে ঝোঁকেন যা অধিকতর কল্যাণকর। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' সহ হানাফি ফিকহের সকল গ্রন্থে ইস্তিহসানকে একটি স্বতন্ত্র উৎস বা দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২. ইস্তিহসানের সংজ্ঞা (تعريف الاستحسان): ইস্তিহসান শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** 'ইস্তিহসান' শব্দটি 'হাসান' (حسن) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—কোনো কিছুকে উত্তম বা ভালো মনে করা, পছন্দ করা, বা অগ্রাধিকার দেওয়া। আরবিতে বলা হয়: **"اسْتَحْسَنْتُ الشَّيْءَ"** অর্থাৎ, "আমি জিনিসটিকে উত্তম মনে করলাম।"
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি উসুলবিদগণ ইস্তিহসানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাগুলো হলো:

১. ইমাম কারখী (রহ.)-এর সংজ্ঞা: " هو العدول عن حكم مسألة في نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي العدول." অর্থ: *"কোনো মাসয়ালায় শক্তিশালী কোনো দলিলের ভিত্তিতে তার সমগোত্রীয় অন্যান্য মাসয়ালার হুকুম (কিয়াস) থেকে সরে এসে ভিন্ন হুকুম প্রদান করাকে ইস্তিহসান বলে।"*

২. **ইমাম সারাখসী (রহ.)-এর সংজ্ঞা: "هو ترك القياس الجلي للقياس الخفي."** অর্থ: *"ইস্তিহসান হলো প্রকাশ্য কিয়াস (কিয়াসে জলী) বর্জন করে সূক্ষ্ম কিয়াস (কিয়াসে খফী) গ্রহণ করা।"* অর্থাৎ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে সমাধানটি সঠিক মনে হয়, তা ত্যাগ করে গভীর দৃষ্টিতে যে সমাধানটি মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর ও শরীয়তের মাকাসিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা গ্রহণ করাই ইস্তিহসান।

৩. ইস্তিহসানের প্রকারভেদ (أقسام الاستحسان): ইস্তিহসান কোনো মনগড়া মতবাদ নয়, বরং এটি শরীয়তের দলিল দ্বারা সমর্থিত। হানাফি ফিকহে ইস্তিহসান প্রধানত চার প্রকারের দলিলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়:

- **১. ইস্তিহসান বিল আসার (নস বা হাদিস দ্বারা):** কিয়াসের চাহিদা ছিল এক রকম, কিন্তু হাদিসে ভিন্ন হুকুম আসায় কিয়াস ছেড়ে দেওয়া হয়। যেমন—রোজা অবস্থায় ভুলবশত কিছু খেলে রোজা ভাঙবে না (হাদিস অনুযায়ী), অথচ কিয়াস বলে পেটে খাবার গেলে রোজা ভাঙা উচিত।

- **২. ইস্তিহসান বিল ইজমা (ঐকমত্য দ্বারা):** যেমন—'ইস্তিসনা' বা অর্ডারি পণ্য তৈরি করার চুক্তি। কিয়াস মতে অস্তিত্বহীন পণ্যের বেচাকেনা নাজায়েয, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে আলেমগণ ইজমার ভিত্তিতে একে জায়েয বলেছেন।

- **৩. ইস্তিহসান বিদ্-দারুরাহ (প্রয়োজনবশত):** যেমন—পবিত্র করার জন্য কূয়া বা হাউজ থেকে নাপাক পানি তুলে ফেলা। কিয়াস বলে, বালতি ফেললে বালতিও নাপাক হয়ে যায়, পানি পবিত্র হবে কীভাবে? কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে একে পবিত্র করার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

- **৪. ইস্তিহসান বিল উরফ (প্রথা দ্বারা):** সমাজে প্রচলিত ভালো প্রথাকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

৪. ইস্তিহসান বৈধ হওয়ার দলিল (أدلة حجية الاستحسان): ইস্তিহসান যে শরীয়তের একটি গ্রহণযোগ্য উৎস, তার স্বপক্ষে হানাফি ফকীহগণ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে শক্তিশালী দলিল পেশ করেন:

(ক) আল-কুরআন থেকে দলিল: আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **"وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ"** অর্থ: *"আর তোমরা অনুসরণ করো উত্তম*

বিষয়টি যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে।" (সূরা যুমার: ৫৫)। এখানে 'আহসান' বা উত্তম বিষয়টি গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ইস্তিহসানের মূল কথা। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: **" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"** অর্থ: *"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, তিনি তোমাদের জন্য কঠোরতা চান না।"* (সূরা বাকারা: ১৮৫)। ইস্তিহসানের মূল উদ্দেশ্যই হলো কাঠিন্য দূর করে সহজ বিধান দেওয়া।

(খ) আল-হাদিস থেকে দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: **" مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ"** অর্থ: *"মুসলমানগণ (তথা মুজতাহিদ ফকীহগণ) যে বিষয়টিকে উত্তম মনে করেন, তা আল্লাহর কাছেও উত্তম।"* (মুসনাদে আহমদ)। এই হাদিসটি ইস্তিহসান বিল ইজমা এবং ইস্তিহসান বিল উরফের সবচেয়ে বড় দলিল।

(গ) যুক্তিবাদী দলিল (আকলী): কিয়াস হলো যুক্তির প্রয়োগ। কিন্তু কখনো কখনো একতরফা যুক্তি প্রয়োগ করলে জুলুম বা ক্ষতি হতে পারে। তখন উচ্চতর যুক্তি বা 'প্রজ্ঞা' প্রয়োগ করে সেই ক্ষতি থেকে বাঁচা জরুরি। এই উচ্চতর প্রজ্ঞাই হলো ইস্তিহসান। যেমন—শিকারী পাখির উচ্ছিষ্ট পানি। কিয়াস অনুযায়ী তা নাপাক (কারণ সে মরা খায়), কিন্তু ইস্তিহসান অনুযায়ী তা পবিত্র (কারণ সে ঠোঁট দিয়ে পান করে, আর ঠোঁট হাড়ের তৈরি যা পবিত্র)। এখানে ইস্তিহসান গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

৫. ভুল ধারণা নিরসন: অনেকে মনে করেন, ইস্তিহসান মানে নিজের খুশিমতো ফতোয়া দেওয়া। এটি ভুল ধারণা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রথমে এর সমালোচনা করেছিলেন এই ভেবে যে এটি "প্রবৃত্তি পূজা"। কিন্তু হানাফি আলেমগণ প্রমাণ করেছেন যে, ইস্তিহসান মানে প্রবৃত্তি নয়, বরং এটি হলো দুটি শরঈ দলিলের মধ্যে শক্তিশালীটিকে (যা বাহ্যত গোপন থাকে) দুর্বলটির (যা বাহ্যত প্রকাশ্য) ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ইস্তিহসান হানাফি ফিকহের গতিশীলতা ও গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম চাবিকাঠি। এটি শরীয়তের দণ্ডবিধি থেকে শুরু করে ইবাদত পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখে। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) তাঁর 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে বহু জটিল মাসয়ালায় কিয়াসের পরিবর্তে ইস্তিহসানের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে, ইস্তিহসান হলো ইসলামী আইনের নমনীয়তা ও মানবতার দলিল।

প্রশ্ন-৩০: ফিকহী বিধানে 'মাকরূহ' এবং 'ইসতিহসান'-এর মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং কোনো কোনো বিধানে কি এদুটি পরস্পর একে অপরের বিপরীত হতে পারে?
(ما هي العلاقة بين "الكراهة" و "الاستحسان" في التشريع الفقهي؟ وهل يتعارضان في بعض الأحكام؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহে বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ ও পদ্ধতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। 'মাকরূহ' (অপছন্দনীয়) এবং 'ইস্তিহসান' (উত্তম বিবেচনা) হানাফি ফিকহের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে একটি হলো নিষেধাজ্ঞার (Negation) দিকে আহ্বানকারী, আর অন্যটি বৈধতার (Validation) দিকে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' সহ ফিকহী গ্রন্থগুলোতে এই দুটির মধ্যে এক চমৎকার সম্পর্ক ও ভারসাম্য রয়েছে। কখনো ইস্তিহসান মাকরূহকে দূর করে, আবার কখনো ইস্তিহসান নিজেই মাকরূহ সাব্যস্ত করে।

২. মাকরূহ ও ইস্তিহসানের তাত্ত্বিক সম্পর্ক (العلاقة النظرية): মাকরূহ এবং ইস্তিহসানের সম্পর্ক মূলত 'কিয়াস' (Analogy) এবং 'জরুরত' (Necessity)-এর দ্বন্দ্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

- **বৈপরীত্যের সম্পর্ক:** সাধারণত কিয়াস কোনো বিষয়কে হারাম বা মাকরূহ ঘোষণা করে, কিন্তু ইস্তিহসান এসে সেই কঠোরতা শিথিল করে বিষয়টিকে জায়েয বা মুবাহ স্তরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, ইস্তিহসান হলো মাকরূহ থেকে মুক্তির একটি পথ (মাখরাজ)।
- **সতর্কতার সম্পর্ক:** আবার কখনো কখনো কিয়াস কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণ পবিত্র ঘোষণা করে, কিন্তু ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম যুক্তি সেখানে সন্দেহের অবকাশ দেখে, ফলে বিধানটি 'সম্পূর্ণ হালাল' থেকে নেমে 'মাকরূহ'-এর স্তরে চলে আসে।

৩. ইস্তিহসান যখন মাকরূহকে দূর করে (الاستحسان يزيل الكراهة): অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইস্তিহসান প্রয়োগের ফলে মাকরূহ বা হারামের বিধান বাতিল হয়ে যায়। এটি মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে করা হয়।

- **উদাহরণ-১ (চিকিৎসা):** সতর বা লজ্জাস্থান দেখা কিয়াস ও সাধারণ নির্দেশে হারাম বা মাকরূহ তাহরীমি। কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তার বা ধাত্রীর

জন্য সতর দেখা 'ইস্তিহসান'-এর ভিত্তিতে জায়েয। এখানে ইস্তিহসান মাকরূহকে দূর করেছে।

- **উদাহরণ-২ (রেশমের ব্যবহার):** পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় পরা মাকরূহ তাহরীমি। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে বা চর্মরোগের কারণে ইস্তিহসানের ভিত্তিতে তা পরিধান করা জায়েয।

- **উদাহরণ-৩ (ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট):** বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি। কিয়াস অনুযায়ী বিড়াল নাপাক প্রাণী (কারণ সে ইঁদুর খায়), তাই তার উচ্ছিষ্ট নাপাক বা মাকরূহ হওয়ার কথা। কিন্তু হাদিসের নির্দেশ ও ইস্তিহসানের ভিত্তিতে (যেহেতু বিড়াল ঘরে ঘুরে বেড়ায় এবং তা থেকে বাঁচা কঠিন) একে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. ইস্তিহসান ও মাকরূহের সহাবস্থান বা দ্বন্দ্ব (التعارض والجمع): কখনো কখনো ইস্তিহসান এবং কিয়াসের দ্বন্দ্বে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে বস্তুটি পবিত্র বা জায়েয হয় বটে, কিন্তু সাথে 'মাকরূহ' বা অপছন্দনীয়তার হুকুম যুক্ত থাকে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'য় এর চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

- **শিকারী পাখির উচ্ছিষ্ট (সুরুত তইরি):** চিল, ঈগল বা শকুনের মতো শিকারী পাখির উচ্ছিষ্ট পানির বিধান কী?

  - **কিয়াস বলে:** এটি নাপাক। কারণ, এই পাখিরা মৃত জন্তু খায় এবং এদের লালা নাপাক। সুতরাং এদের উচ্ছিষ্ট পানিও নাপাক হওয়া উচিত।

  - **ইস্তিহসান বলে:** এটি পবিত্র। কারণ, পাখিরা ঠোঁট দিয়ে পানি পান করে। এদের ঠোঁট হলো হাড়ের মতো শক্ত ও শুষ্ক, যাতে লালা লেগে থাকে না (যেমন কুকুরের জিভে থাকে)। সুতরাং ঠোঁট পবিত্র হওয়ায় পানিও পবিত্র।

  - **ফলাফল (ভারসাম্য):** হানাফি ফকীহগণ ইস্তিহসানের দলিল গ্রহণ করে পানিকে 'পবিত্র' (তাহারাত) বলেছেন, কিন্তু কিয়াসের যুক্তিকে পুরোপুরি ফেলে না দিয়ে একে 'মাকরূহ' (তানযিহি) বলেছেন। অর্থাৎ, অন্য পানি থাকলে এটি ব্যবহার করা মাকরূহ। এখানে ইস্তিহসান বস্তুটিকে নাপাকি থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু মাকরূহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি।

৫. ইস্তিহসানের মাধ্যমে মাকরূহ সাব্যস্ত হওয়া: কখনো কখনো কিয়াস কোনো কাজকে বৈধ বলে, কিন্তু ইস্তিহসান বা গভীর প্রজ্ঞা সেটাকে মাকরূহ বলে।

- **উদাহরণ (মিথ্যা বলা):** জিহাদের ময়দানে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া বা মিথ্যা বলা কিয়াস অনুযায়ী হারাম বা মাকরূহ। কিন্তু ইস্তিহসান অনুযায়ী যুদ্ধের কৌশলে মিথ্যা বলা বা ধোঁকা দেওয়া জায়েয, এমনকি ওয়াজিব হতে পারে।

- **বিপরীত উদাহরণ:** কিয়াস অনুযায়ী নিজের সম্পদ ইচ্ছেমতো খরচ করা জায়েয। কিন্তু ইস্তিহসান বা সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিতে অপচয় করা মাকরূহ তাহরীমি।

৬. ফিকহী মূলনীতি: ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) এবং হানাফি ফকীহগণ এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি অনুসরণ করেন: **"إذا تعارض القياس والاستحسان، فالعمل بالاستحسان أولى إلا في مواضع نادرة."** অর্থ: *"যখন কিয়াস ও ইস্তিহসানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন ইস্তিহসানের ওপর আমল করা উত্তম, তবে বিরল কিছু ক্ষেত্র ছাড়া।"* এই অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণেই অনেক 'মাকরূহ' কাজ বিশেষ পরিস্থিতিতে 'মুবাহ' বা 'মুস্তাহাব' হয়ে যায়।

৭. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, মাকরূহ এবং ইস্তিহসান একে অপরের বিপরীতমুখী শক্তি হলেও ফিকহী বিধান প্রণয়নে এরা একে অপরের পরিপূরক। ইস্তিহসান হলো ফকীহের হাতে থাকা এমন এক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে তিনি মাকরূহ বা হারামের কঠোরতাকে নমনীয় করেন এবং শরীয়তকে মানুষের সাধ্যের মধ্যে রাখেন। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই দুটির সার্থক প্রয়োগ প্রমাণ করে যে, ইস্তিহসান ছাড়া ফিকহ অচল, আর মাকরূহ ছাড়া তাকওয়া অসম্পূর্ণ। ফকীহ এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই চূড়ান্ত ফতোয়া প্রদান করেন।

اللقيط و اللقطة : পরিত্যক্ত শিশু ও পড়ে থাকা বস্তু

প্রশ্ন-৩১: ফিকহে 'পরিত্যক্ত শিশু' (আল-লাক্বীত)-এর সংজ্ঞা দাও। গ্রন্থে বর্ণিত তার ভরণপোষণ, অভিভাবকত্ব এবং বংশগত বিধান কী?

(عرف "اللقيط" في الفقه - وما هي أحكام نفقته وولايته ونسبه كما جاء في الكتاب؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবজীবনের প্রতিটি পর্যায়, বিশেষ করে অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় মানুষের অধিকার রক্ষায় ইসলাম যে বিধান দিয়েছে, তা নজিরবিহীন। সমাজের একটি নির্মম বাস্তবতা হলো 'লাক্বীত' বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশু, যাকে তার পিতামাতা দারিদ্র্য বা লোকলজ্জার ভয়ে রাস্তায় ফেলে যায়। এই অসহায় শিশুটির বেঁচে থাকার অধিকার, তার বংশ পরিচয় এবং ভরণপোষণ নিশ্চিত করার জন্য 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বিধানগুলো মূলত শিশুর অধিকার বা 'হুকুকুত তিফল'-এর অন্তর্ভুক্ত।

২. 'আল-লাক্বীত'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف اللقيط):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'লাক্বীত' (اللقيط) শব্দটি আরবি 'লাক্বাত' (لقط) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—কুড়িয়ে নেওয়া বা তুলে নেওয়া। যেহেতু এই শিশুকে রাস্তা বা জনপদ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া হয়, তাই তাকে লাক্বীত বলা হয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আস-সিরাজিয়া'র আলোকে লাক্বীত-এর সংজ্ঞা হলো: **"هُوَ حَيٌّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تُهْمَةِ الزِّنَا"** অর্থ: *"লাক্বীত হলো এমন জীবিত নবজাতক, যাকে তার পরিবারের লোকেরা দারিদ্র্যের ভয়ে অথবা যিনার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য পরিত্যাগ করেছে এবং যার বংশ পরিচয় ও দাবিদার অজ্ঞাত।"*

৩. গ্রন্থে বর্ণিত লাক্বীতের বিধানসমূহ (أحكام اللقيط): ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) পরিত্যক্ত শিশুর অধিকার ও মঙ্গলের জন্য তিনটি প্রধান বিষয়ে বিধান বর্ণনা করেছেন:

(ক) বংশ পরিচয় ও স্বাধীনতার বিধান (أحكام النسب والحرية): পরিত্যক্ত শিশুর সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট:

- **স্বাধীন সত্তা (হুররিয়াত):** হানাফি ফিকহের মূলনীতি হলো— **"الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّ الْحُرِّيَّةُ"** (মানুষের ক্ষেত্রে মৌলিক অবস্থা হলো স্বাধীনতা)। সুতরাং, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি 'স্বাধীন' (আজাদ) বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে (মুলতাক্বিত), সে তাকে দাস বানাতে পারবে না। যদি কেউ তাকে নিজের দাস বলে দাবি করে, তবে তার প্রমাণ (সাক্ষী) ছাড়া তা গ্রহণ করা হবে না।

- **বংশ স্থাপন (নসব):** ১. যদি কেউ শিশুটিকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে, তবে তার দাবির ভিত্তিতে শিশুটির বংশ তার সাথে সাব্যস্ত হবে (যদি এতে শিশুর ক্ষতি না হয়)। ২. যদি একাধিক ব্যক্তি দাবি করে, তবে যে প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) পেশ করতে পারবে, সে অগ্রাধিকার পাবে। ৩. যদি মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ে দাবি করে, তবে মুসলিম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (হানাফি মতে)।

- **ধর্ম:** যদি শিশুটি কোনো মুসলিম এলাকায় বা মসজিদের পাশে পাওয়া যায়, তবে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কোনো অমুসলিম উপাসনালয়ে বা গ্রামে পাওয়া যায়, তবে তাকে সেই ধর্মের অনুসারী ধরা হবে। তবে ইসলাম যেহেতু বিজয়ী ধর্ম, তাই সন্দেহের ক্ষেত্রে তাকে মুসলিম ধরাই উত্তম।

(খ) অভিভাবকত্ব ও লালন-পালন (الولاية والحضانة): শিশুটিকে কে লালন-পালন করবে, তার বিধান নিম্নরূপ:

- **আশ্রয়দাতার অধিকার:** যে ব্যক্তি শিশুটিকে প্রথম কুড়িয়ে পেয়েছে, লালন-পালনের ক্ষেত্রে তার অধিকার সবার আগে। তাকে 'মুলতাক্বিত' বলা হয়।

- **হস্তান্তর:** মুলতাক্বিত যদি শিশুটির দেখাশোনা করতে সক্ষম ও বিশ্বস্ত হয়, তবে রাষ্ট্র বা অন্য কেউ তার কাছ থেকে জোর করে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তবে যদি সে অত্যাচারী হয় বা শিশুর মালের ক্ষতি করে, তবে বিচারক (কাজী) শিশুটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে অন্য কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে বা রাষ্ট্রীয় শিশু সদনে ন্যস্ত করবেন।

- **উত্তরাধিকার:** মুলতাক্বিত শিশুটির অভিভাবক হলেও সে শিশুর ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হবে না। কারণ, কুড়িয়ে পাওয়ার দ্বারা বংশ বা উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

(গ) ভরণপোষণ বা নাফাক্বা (أحكام النفقة): শিশুটির খাবার, পোশাক ও চিকিৎসার খরচ কে বহন করবে? ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) এ বিষয়ে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন:

- **প্রথমত (শিশুর সম্পদ):** যদি শিশুটিকে পাওয়ার সময় তার সাথে কোনো সম্পদ (টাকা-পয়সা বা দামী অলঙ্কার) পাওয়া যায়, তবে বিচারকের নির্দেশে সেই সম্পদ খরচ করেই তার ভরণপোষণ করা হবে।

- **দ্বিতীয়ত (বায়তুল মাল):** যদি শিশুর নিজস্ব কোনো সম্পদ না থাকে, তবে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের বা 'বায়তুল মাল'-এর। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তার যাবতীয় খরচ বহন করবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার কেউ নেই, রাষ্ট্র তার অভিভাবক।"

- **তৃতীয়ত (আশ্রয়দাতার ঋণ):** যদি বায়তুল মালে অর্থ না থাকে বা সেখান থেকে সাহায্য পাওয়া না যায়, তবে বিচারক মুলতাক্বিতকে নির্দেশ দেবেন শিশুর জন্য খরচ করতে। এই খরচটি মুলতাক্বিতের জন্য 'ঋণ' হিসেবে গণ্য হবে না (যদি সে সওয়াবের নিয়তে করে)। তবে যদি সে বিচারকের অনুমতি নিয়ে খরচ করে এই শর্তে যে শিশুটি বড় হয়ে তা শোধ করবে, তবে তা শিশুর ওপর ঋণ হিসেবে থাকবে এবং বড় হয়ে সামর্থ্যবান হলে সে তা পরিশোধ করবে। কিন্তু হানাফি মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, বায়তুল মাল থেকেই এই খরচ দেওয়া উচিত, কারণ এটি ফরজে কিফায়া।

৪. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আল-লাক্বীত' সংক্রান্ত বিধানগুলো ইসলামী আইনের মানবিক দিকটি উজ্জ্বল করে তোলে। একটি পরিচয়হীন শিশুকে সমাজ যাতে বোঝা মনে না করে বা তাকে দাস হিসেবে ব্যবহার না করে, সেজন্য হানাফি ফিকহে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর বর্ণনা মতে, এই শিশু স্বাধীন, সম্মানিত এবং রাষ্ট্রের জিম্মাদারিতে লালিত-পালিত হওয়ার অধিকার রাখে। এটি কেবল দয়া নয়, বরং এটি শিশুর প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা।

প্রশ্ন-৩২: পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার বিধান দেওয়ার পেছনে শরীয়তের রহস্য কী? হানাফীদের মতে এটি কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম কী?
(ما هي الحكمة من مشروعية التقاط اللقيط؟ وما هو حكم التقاطه عند الحنفية؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বা 'মাকাসিদুশ শরীয়াহ' হলো মানুষের জান-মাল ও ইজ্জতের সুরক্ষা। এর মধ্যে 'হিফজুন নফস' বা প্রাণের সুরক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তায় বা নির্জন স্থানে পড়ে থাকা অসহায় শিশু বা 'লাক্বীত'কে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানো এবং তাকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা একটি মহৎ ইবাদত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই কাজের শরঈ মর্যাদা এবং হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এটি কেবল একটি সামাজিক কাজ নয়, বরং পরকালীন মুক্তির উসিলা।

২. পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার হেকমত বা রহস্য (الحكمة من المشروعية): শরীয়ত কেন পরিত্যক্ত শিশুকে আশ্রয় দেওয়ার প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছে, তার পেছনে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ রয়েছে:

(ক) প্রাণের সুরক্ষা (احياء النفس): আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: **"وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"** অর্থ: *"যে ব্যক্তি একটি প্রাণ বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো।"* (সূরা মায়েদা: ৩২)। পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে না নিলে ক্ষুধা, পিপাসা, হিংস্র প্রাণী বা আবহাওয়ার কারণে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাকে কুড়িয়ে নেওয়া মানে একটি জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

(খ) মানব বংশ রক্ষা: শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাকে বাঁচানোর মাধ্যমে মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখা হয়। ইসলামে মানবসম্পদ নষ্ট করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

(গ) সামজিক অপরাধ রোধ: যদি এই শিশুদের আশ্রয় দিয়ে সুশিক্ষিত না করা হয়, তবে তারা বড় হয়ে অপরাধী বা সমাজের বোঝা হয়ে উঠতে পারে। অথবা অসাধু চক্র তাদের দাসবৃত্তি বা অনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে পারে। তাই এদের দায়িত্ব নেওয়া মূলত সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখার একটি কৌশল।

(ঘ) সওয়াব ও জান্নাত লাভ: এটি একটি মহান সদকায়ে জারিয়া। একটি এতিম বা অসহায় শিশুকে লালন-পালন করার সওয়াব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"আমি এবং এতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি থাকব।"

৩. হানাফীদের মতে কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম (حكم الالتقاط عند الحنفية): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) এবং হানাফি ফকীহগণ একে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন:

(ক) মুস্তাহাব বা উত্তম (المستحب): সাধারণ অবস্থায়, যখন শিশুটি এমন জায়গায় আছে যেখানে তার প্রাণহানির তাৎক্ষণিক আশঙ্কা নেই (যেমন বাজারের পাশে বা জনবসতিতে) এবং সেখানে অন্য লোকও আছে যারা তাকে নিতে পারে—তখন তাকে কুড়িয়ে নেওয়া **মুস্তাহাব**। এটি নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কারণ এতে একটি জীবন বাঁচে, যা কাবা শরীফ তাওয়াফ করার চেয়েও বড় মানবিক কাজ হতে পারে।

(খ) ওয়াজিব বা আবশ্যক (الواجب): যখন শিশুটি এমন জায়গায় থাকে যেখানে তাকে না নিলে তার মৃত্যু নিশ্চিত (যেমন—গহীন জঙ্গল, পানির পাশে, আগুনের কাছে বা তীব্র শীতে খোলা আকাশের নিচে) এবং সেখানে কুড়িয়ে নেওয়ার মতো অন্য কেউ নেই—তখন তাকে উদ্ধার করা ওই ব্যক্তির ওপর **ফরজে আইন বা ওয়াজিব** হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি সে শিশুটিকে ফেলে চলে যায় এবং শিশুটি মারা যায়, তবে ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে 'ক্বাতলে সাবাব' বা পরোক্ষ হত্যার দায়ে দায়ী হবে এবং গুনাহগার হবে। হানাফি ফিকহের মূলনীতি হলো— **"ضرورة حفظ النفس المحترمة"** (সম্মানিত প্রাণ রক্ষা করা জরুরি)।

(গ) সাক্ষ্য রাখার বিধান: শিশুটিকে কুড়িয়ে নেওয়ার সময় সাক্ষী রাখা কি ওয়াজিব?

- **হানাফি মত:** কুড়িয়ে নেওয়ার সময় সাক্ষী রাখা **মুস্তাহাব**, ওয়াজিব নয়। তবে সাক্ষী রাখা উত্তম যাতে ভবিষ্যতে কেউ শিশুটির ওপর দাসত্বের দাবি করতে না পারে এবং তার বংশ পরিচয় সুরক্ষিত থাকে। সাক্ষী রাখলে মুলতাক্বিতের নিয়তও পরিষ্কার থাকে যে, সে আল্লাহর ওয়াস্তে শিশুটিকে নিয়েছে।

৪. কুড়িয়ে নেওয়ার পর দায়িত্ব: হানাফি মতে, কুড়িয়ে নেওয়ার পর তাকে আবার রাস্তায় ফেলে দেওয়া হারাম। একবার আশ্রয় দিলে তার দায়িত্ব নিতে হবে অথবা

রাষ্ট্র বা বিচারকের কাছে সোপর্দ করতে হবে। কারণ, "শুরু করা নফল কাজ পূর্ণ করা ওয়াজিব"-এর মতো একবার জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব নিলে তা মাঝপথে ছাড়া যায় না।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'লাক্বীত' বা পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া ইসলামী শরীয়তে কেবল বৈধই নয়, বরং এটি ঈমানের দাবি। হানাফি ফিকহে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে একে মুস্তাহাব থেকে ওয়াজিব পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। এর পেছনের মূল রহস্য হলো আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং মানবতাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা। যারা এই মহান দায়িত্ব পালন করে, সমাজ ও শরীয়ত তাদের সর্বোচ্চ সম্মানের চোখে দেখে।

প্রশ্ন-৩৩: হানাফী ফিকহে পড়ে থাকা বস্তুর ঘোষণার পদ্ধতি এবং এর সময়কাল ব্যাখ্যা কর। কুড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তি কখন এর মালিক হতে পারে?

اشرح كيفية تعريف اللقطة ومدته في الفقه الحنفي - ومتى يمتلك الملتقط اللقطة؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): মানুষের চলাফেরার পথে অনেক সময় মূল্যবান বস্তু পড়ে থাকতে দেখা যায়। ইসলামী পরিভাষায় একে 'আল-লুক্বতাহ' (اللقطة) বলে। অন্যের সম্পদ বা মাল কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির জন্য একটি পরীক্ষা। সে কি এটি নিজের পকেটে ভরবে, নাকি মালিকের কাছে পৌঁছে দেবে? ইসলাম এখানে আমানতদারিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে বলেছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা বা 'তা'রীফ' এবং এর মালিকানা লাভের সময়সীমা নিয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২. ঘোষণা বা প্রচারের পদ্ধতি (كيفية التعريف): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কোনো বস্তু কুড়িয়ে পাওয়ার পর প্রাপ্তিকারীর (মুলতাক্বিত) প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো এর মালিককে খোঁজা। এই খোঁজার প্রক্রিয়াকে 'তা'রীফ' বা ঘোষণা বলা হয়। ঘোষণার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- **ঘোষণার স্থান:** বস্তুটি যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানেই এবং তার আশেপাশের জনসমাগমস্থলে ঘোষণা দিতে হবে। যেমন—বাজার, মসজিদের দরজা (নামাজের সময় বাদে, যাতে মুসল্লিদের কষ্ট না হয়), এবং

লোকালয়ের মোড়গুলোতে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া বা মাইকিংও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

- **ঘোষণার ভাষা:** ঘোষণাকারী বস্তুর একটি সাধারণ বিবরণ দেবে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেবে না। যেমন বলবে, "আমি একটি টাকার থলি পেয়েছি" বা "একটি ঘড়ি পেয়েছি"। কিন্তু থলির রং, টাকার পরিমাণ বা ঘড়ির ব্র্যান্ড উল্লেখ করবে না।

- **উদ্দেশ্য:** বিশেষ চিহ্ন গোপন রাখার উদ্দেশ্য হলো আসল মালিককে যাচাই করা। যখন কেউ দাবি করবে, তখন তাকে সেই গোপন চিহ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে সঠিক উত্তর দিতে পারে, তবেই তাকে মাল ফেরত দেওয়া হবে।

৩. ঘোষণার সময়কাল (مدة التعريف): ঘোষণা কতদিন ধরে দিতে হবে, এ নিয়ে হানাফি ফকীহগণের মধ্যে এবং বস্তুর মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ভিন্নমত ও সিদ্ধান্ত রয়েছে:

(ক) ১০ দিরহাম বা তার বেশি মূল্যের বস্তু: যদি বস্তুটি মূল্যবান হয় (হানাফি নিসাব অনুযায়ী ১০ দিরহাম বা তার বেশি), তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী **এক বছর** (১ বছর) পর্যন্ত ঘোষণা দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম কুদুরী (রহ.) এবং হিদায়া প্রণেতা এই মত ব্যক্ত করেছেন।

(খ) কম মূল্যের বা তুচ্ছ বস্তু: যদি বস্তুটি অল্প মূল্যের হয় (১০ দিরহামের কম), তবে কতদিন ঘোষণা দিতে হবে, তা কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির বিবেচনার (জন্নে গালিব) ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, সে ততদিন ঘোষণা দেবে যতদিন তার মনে প্রবল ধারণা হয় যে, মালিক এখনো খুঁজছে। যখন মনে হবে মালিক আর খুঁজবে না, তখন ঘোষণা বন্ধ করা যাবে। কারো মতে ৩ দিন, কারো মতে ১০ দিন।

(গ) ইমাম সিরাজুদ্দীনের মত (আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া): 'আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে, সময়কাল নির্দিষ্ট করার চেয়ে বস্তুর মানের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তুচ্ছ বস্তু (যেমন খেজুর, সামান্য টাকা) হলে ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বা খুব অল্প সময় দিলেই হবে। আর মূল্যবান হলে মালিকের নিরাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

৪. মালিকানা লাভের সময় ও শর্ত (متى يمتلك الملتقط اللقطة؟): ঘোষণার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যদি মালিক না পাওয়া যায়, তবে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি কি সেই বস্তুর মালিক হতে পারবে? এখানে হানাফি ফিকহে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হুকুম দেওয়া হয়েছে:

(ক) প্রাপক যদি ধনী (গনী) হয়: যদি কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি ধনী হয় (নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক), তবে সে কোনোভাবেই ওই বস্তুর মালিক হতে পারবে না এবং তা ভোগ করতে পারবে না।

- **করণীয়:** তার ওপর ওয়াজিব হলো বস্তুটি কোনো গরিব বা মিসকীনকে সদকা করে দেওয়া। সদকা করার সময় নিয়ত করবে যে, যদি মালিক আসে এবং সদকা মেনে না নেয়, তবে আমি জরিমানা দেব। ধনী ব্যক্তি নিজে ব্যবহার করা হারাম।

(খ) প্রাপক যদি দরিদ্র (ফকির) হয়: যদি কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তবে ঘোষণার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সে নিজেই বস্তুটি ব্যবহার করতে পারবে এবং তার মালিক হতে পারবে।

- **শর্ত:** তাকে এই নিয়ত রাখতে হবে যে, যদি ভবিষ্যতে কখনো মালিক এসে উপস্থিত হয়, তবে সে তা ফেরত দিতে বা তার মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস— "ঘোষণার পর যদি মালিক না আসে, তবে তা তোমার মাল।" হানাফি ফকীহগণ একে দরিদ্রের জন্য খাস করেছেন।

(গ) মালিকের অধিকার: যদি সদকা করে দেওয়ার পর বা নিজে ব্যবহার করার পর আসল মালিক ফিরে আসে, তবে মালিকের তিনটি এখতিয়ার থাকবে: ১. সদকা মেনে নিয়ে সওয়াবের আশা করা। ২. প্রাপকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করা (এক্ষেত্রে প্রাপক জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে)। ৩. যদি মালটি তখনো বিদ্যমান থাকে, তবে তা ফেরত নেওয়া।

৫. উপসংহার (خاتمة): হারানো প্রাপ্তি বা 'লুক্বতাহ' সংক্রান্ত বিধানগুলো সমাজে আমানতদারিতা ও সততার চর্চা নিশ্চিত করে। হানাফি ফিকহে ঘোষণার পদ্ধতি ও সময়সীমা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে মালিক তার সম্পদ ফিরে পাওয়ার

সর্বোচ্চ সুযোগ পায়। আবার মেয়াদ শেষে তা গরিবের হক বা সদকা হিসেবে নির্ধারণ করে সম্পদের অপচয় রোধ করা হয়েছে। ধনী প্রাপকের জন্য এটি ভোগ করা নিষিদ্ধ করে লোভ সংবরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র এক অনন্য নৈতিক দর্শন।

الصيد والذبائح : শিকার ও জবাইকৃত প্রাণী

প্রশ্ন-৩৪: যে শিকারের গোশত খাওয়া জায়েয, তার সংজ্ঞা দাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী (কুকুর ও পাখি) দ্বারা শিকার করার শুদ্ধতার শর্তাবলি কী কী?
عرف "الصيد" الذي يباح أكله - وما هي شروط صحة الصيد بالجوارح (المدربة (الكلب والطائر)؟

১. ভূমিকা (مقدمة): আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু ভক্ষণ করা হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন। মানুষের খাদ্যের একটি বড় উৎস হলো প্রাণিজগত। গৃহপালিত পশু যেমন জবেহ করার মাধ্যমে হালাল হয়, তেমনি বন্য হালাল প্রাণী শিকার করার মাধ্যমে ভক্ষণের উপযোগী হয়। শিকার বা 'আস-সায়দ' ইসলামি ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে শিকার বৈধ হওয়ার শর্তাবলি, বিশেষ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীর মাধ্যমে শিকারের বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

২. শিকার (আস-সায়দ)-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الصيد):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'সায়দ' (الصيد) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো—ধরা, গ্রেফতার করা বা বশ করা। যে প্রাণীকে ধরা হয় তাকেও রূপক অর্থে 'সায়দ' বলা হয়।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, যে শিকারের গোশত খাওয়া জায়েয তার সংজ্ঞা হলো: **"هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، الذي لا يقدر عليه إلا بالحيلة."** অর্থ: *"শিকার হলো এমন প্রাণী যা জন্মগতভাবে বন্য এবং মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে না, যাকে কৌশল বা যন্ত্র ছাড়া ধরা সম্ভব নয়, এবং যার গোশত খাওয়া শরীয়তে বৈধ।"*

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. বন্য হওয়া (মুতাওয়াহহিশ): প্রাণীটি স্বভাবগতভাবে বন্য হতে হবে (যেমন—হরিণ, বুনো গরু)। গৃহপালিত প্রাণী (যেমন—ছাগল, মুরগি) পালিয়ে গেলে তাকে 'শিকার' বলা হয় না, তাকে ধরে সাধারণ নিয়মে জবেহ করতে হয়। 2. **বাধা প্রদানকারী (মুমতানি):** প্রাণীটির নিজের পায়ে পালিয়ে যাওয়ার বা আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। 3. **হালাল প্রজাতি:** প্রাণীটি শরীয়তসম্মত হালাল

প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। বাঘ বা সিংহ শিকার করা গেলেও তা খাওয়া জায়েয নয়।

৩. শিকারের প্রকারভেদ: ফিকহের পরিভাষায় শিকার সাধারণত দুইভাবে করা হয়: **১. অস্ত্রের সাহায্যে শিকার:** তীর, বল্লম, বা বন্দুকের গুলি ব্যবহার করে। ২. **প্রাণীর সাহায্যে শিকার:** প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর, চিতা বা বাজপাখি ব্যবহার করে।

৪. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী দ্বারা শিকারের শর্তাবলি (شروط الصيد بالجوارح): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীর সাহায্যে শিকার হালাল হওয়ার জন্য শিকারী প্রাণী এবং প্রেরকের মধ্যে বিশেষ কিছু শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। শর্তগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) শিকারী প্রাণীর গুণাবলি (শর্তসমূহ): শিকারী প্রাণীটি কুকুর হোক বা পাখি (বাজপাখি/ঈগল), তাকে অবশ্যই **'মুআল্লাম'** বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: *"আর তোমরা যেসব শিকারী প্রাণীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছ..."* (সূরা মায়েদা: ৪)।

- **১. কুকুরের প্রশিক্ষণের মানদণ্ড:** কুকুর বা চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত হলো—শিকার ধরার পর সে তা খাবে না, বরং মালিকের জন্য রেখে দেবে। হানাফি মাযহাব মতে, যদি কুকুর শিকার ধরার পর নিজেই তা থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তবে ওই শিকার খাওয়া **হারাম**। কারণ, এতে বোঝা যায় সে নিজের জন্য শিকার করেছে, মালিকের জন্য নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যদি সে খেয়ে ফেলে তবে খেও না, কারণ সে নিজের জন্য ধরেছে।"* তবে এই নিয়ম তিনবার পরীক্ষা করতে হবে। তিনবার শিকার ধরে না খেলে তাকে প্রশিক্ষিত ধরা হবে।

- **২. পাখির প্রশিক্ষণের মানদণ্ড:** বাজপাখি বা শিকারী পাখির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত হলো—ডাকার সাথে সাথে ফিরে আসা। পাখি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেললে হানাফি মতে কোনো সমস্যা নেই এবং শিকার হালাল হবে। কারণ পাখিকে কুকুরের মতো মেরে শিক্ষা দেওয়া যায় না, তাই খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করা তার জন্য শর্ত নয়।

- **৩. আঘাতের কারণে মৃত্যু:** শিকারী প্রাণীটি তার নখ বা দাঁত দিয়ে শিকারকে আঘাত করে জখম করতে হবে। যদি কেবল ভয় পেয়ে বা চাপে শিকার মারা যায়, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে না।

(খ) শিকারী প্রেরণকারীর (শিকারীর) শর্তাবলি:

- **১. বিসমিল্লাহ বলা:** শিকারী প্রাণী বা কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার সময় শিকারীকে অবশ্যই **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'** বলতে হবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয়, তবে শিকার খাওয়া হারাম (মৃত প্রাণীর মতো)। আর যদি ভুলবশত ছেড়ে দেয়, তবে খাওয়া জায়েয।

- **২. প্রেরণ করা (ইরসাল):** কুকুর বা পাখিকে শিকারী নিজেই পাঠাতে হবে। যদি কুকুর নিজে নিজেই কোনো হরিণ দেখে দৌড় দেয় এবং শিকার করে আনে, তবে তা হালাল হবে না। তবে কুকুর নিজে দৌড় দেওয়ার পর যদি শিকারী তাকে ধমক দেয় বা উৎসাহ দেয় এবং সে আরও জোরে দৌড়ায়, তবে তা হালাল হবে।

- **৩. অন্য কোনো প্রাণীর অংশগ্রহণ না থাকা:** শিকারের কাজে নিজের প্রশিক্ষিত কুকুরের সাথে অন্য কোনো অপ্রশিক্ষিত বা অন্যের কুকুর শরিক হতে পারবে না। হাদিসে এসেছে, *"যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর পাও এবং শিকার মারা যায়, তবে তা খেও না। কারণ তুমি তোমার কুকুরের ওপর বিসমিল্লাহ পড়েছ, অন্যেরটির ওপর পড়নি।"*

৫. জীবিত অবস্থায় পেলে করণীয়: প্রশিক্ষিত প্রাণী শিকারকে ধরে আনার পর যদি শিকারী দেখে যে প্রাণীটি এখনো জীবিত আছে (বেঁচে থাকার লক্ষণ স্পষ্ট), তবে তাকে অবশ্যই ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরঈ পদ্ধতিতে **জবেহ** করতে হবে। জবেহ না করলে এবং প্রাণীটি মারা গেলে তা খাওয়া হারাম হবে। আর যদি প্রাণীটি আঘাতের কারণেই শিকারীর কাছে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়, তবে তা জবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল।

৬. উপসংহার (خاتمة): ইসলামে শিকার নিছক বিনোদনের বিষয় নয়, বরং এটি জীবিকা আহরণের একটি উপায়। তাই এর সাথে আল্লাহর নাম ও শরঈ নিয়মকানুন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে বর্ণিত এই শর্তগুলো প্রমাণ করে যে, হালাল রিজিক অন্বেষণের ক্ষেত্রেও মুমিনকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে হয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের 'না

খাওয়া'র শর্তটি হানাফি ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম মাসয়ালা, যা শিকারীর নিয়ত ও প্রাণীর আনুগত্যের প্রমাণ বহন করে।

প্রশ্ন-৩৫: জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য জবাইকারী (যাবেহ) এবং যবাইয়ের যন্ত্রের মধ্যে কোন্ শর্তগুলো থাকা আবশ্যক? ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম কী?
(ما هي الشروط التي يجب توافرها في "الذابح" و "الآلة" حتى تصح الذبيحة؟ وما هو حكم ترك التسمية عمدا أو نسيانا؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে স্থলচর প্রাণীর গোশত হালাল হওয়ার জন্য প্রধান মাধ্যম হলো 'যাবাহ' বা জবাই। জবাইয়ের মাধ্যমে প্রাণীর শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত বের করে দেওয়া হয়, যা অপবিত্র ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। জবাই ছাড়া কোনো প্রাণী মারা গেলে তা 'মায়তাহ' বা মৃত জন্তু হিসেবে গণ্য হয়, যা ভক্ষণ করা হারাম। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য জবাইকারী ও যন্ত্রের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি এবং তাসমিয়া বা বিসমিল্লাহ পাঠের বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

২. জবাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الذبح): একটি জবাই শরঈ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দুটি প্রধান উপাদানের শর্ত পূরণ করতে হয়: জবাইকারী (যাবেহ) এবং জবাইয়ের যন্ত্র (আলাহ)।

(ক) জবাইকারীর শর্তাবলি (شروط الذابح): যিনি পশু জবাই করবেন, তাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণের অধিকারী হতে হবে:

- **১. দ্বীন বা ধর্ম:** জবাইকারীকে অবশ্যই **মুসলিম** অথবা **কিতাবী** (ইহুদি বা খ্রিস্টান) হতে হবে।
    - মূর্তিপূজারী, অগ্নিপূজারী, মুশরিক বা মুরতাদের (ধর্মত্যাগী) জবাই করা পশু কোনোভাবেই হালাল নয়।
    - কিতাবীদের জবাই হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তারা জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো (যেমন ঈসা আ. বা মূর্তির) নাম নিতে পারবে না। তবে মুসলিমের জবাই সর্বাবস্থায় উত্তম।

- **২. আকল বা বিবেক:** জবাইকারীকে বিবেকবান বা সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগল বা মাতাল ব্যক্তির জবাই শুদ্ধ নয়, যদি না তারা জবাইয়ের গুরুত্ব বোঝে। তবে বোধশক্তিমান শিশু বা নারী জবাই করলে তা জায়েয।

- **৩. নিসবত বা উদ্দেশ্য:** জবাইকারীকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বা খাওয়ার উদ্দেশ্যে জবাই করতে হবে। গায়রুল্লাহর নামে (যেমন পীর, মাজার বা দেবদেবীর নামে) উৎসর্গকৃত পশু জবাই করা হারাম, যদিও জবাইয়ের সময় মুখে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয়।

(খ) জবাইয়ের যন্ত্রের শর্তাবলি (شروط الآلة): যে যন্ত্র দিয়ে জবাই করা হবে, তার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

- **১. ধারালো হওয়া:** যন্ত্রটি এমন ধারালো হতে হবে যা পশুর চামড়া ও রগ কেটে রক্ত প্রবাহিত করতে সক্ষম। ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বা চাপ দিয়ে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

- **২. উপাদানের প্রকৃতি:** লোহা, পাথর, কাঁচ, বাঁশের কঞ্চি বা যেকোনো ধারালো বস্তু দিয়ে জবাই করা জায়েয। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা ভক্ষণ করো।"*

- **৩. নিষিদ্ধ বস্তু: দাঁত** এবং **নখ** দিয়ে জবাই করা জায়েয নয়। হাদিসে স্পষ্টভাবে দাঁত (যা হাড়) এবং নখ (যা কাফেরদের ছুরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়) দিয়ে জবাই করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৩. জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' (তাসমিয়া) পাঠের বিধান: জবাই শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো আল্লাহর নাম নেওয়া। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন: *"যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা ভক্ষণ করো না।"* (সূরা আনআম: ১২১)। বিসমিল্লাহ পাঠের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবে তিনটি অবস্থা রয়েছে:

(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করা (ترك التسمية عمداً): যদি জবাইকারী জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা ছেড়ে দেয়, তবে হানাফি মাযহাব মতে ওই পশুর গোশত খাওয়া **হারাম**।

- **যুক্তি:** কুরআনের নির্দেশে আল্লাহর নাম নেওয়া ফরজ। ইচ্ছাকৃত বর্জনকারী সেই ফরজ লঙ্ঘন করেছে, ফলে পশুটি 'মায়তাহ' বা মৃত জন্তুর হুকুমে চলে যাবে।

- **শাফেয়ী মতের পার্থক্য:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়লেও গোশত হালাল, তবে মাকরূহ। কিন্তু হানাফি ফিকহে এই শিথিলতা গ্রহণ করা হয়নি।

(খ) ভুলবশত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করা (ترك التسمية نسياناً): যদি জবাইকারী বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় (মনে ছিল কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় মুখে আসেনি), তবে হানাফি মাযহাব এবং জুমহুর উলামাদের মতে ওই পশুর গোশত খাওয়া **সম্পূর্ণ হালাল**।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং জবরদস্তির হুকুম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।"* তাছাড়া মুমিনের অন্তরে সবসময় আল্লাহর নাম থাকে, তাই মুখের বিস্মৃতি ক্ষমাযোগ্য।

(গ) বিসমিল্লাহর সাথে অন্য নাম যুক্ত করা: যদি কেউ বলে "বিসমিল্লাহি ওয়া নামি ফুলান" (আল্লাহ ও অমুকের নামে), তবে পশুটি হারাম হয়ে যাবে।

৪. জবাইয়ের পদ্ধতি ও রগ কাটার পরিমাণ: হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, গলায় জবাই করার সময় চারটি রগ বা নালী থাকে: ১. শ্বাসনালী (Hulqum) ২. খাদ্যনালী (Mari') ৩. ও ৪. কণ্ঠনালীর দুই পাশের দুটি মোটা রক্তনালী (Wadajayn)।

- **হুকুম:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, এই চারটির মধ্যে অন্তত **তিনটি** কাটা গেলে জবাই শুদ্ধ হয়ে যাবে। অধিকাংশ রগ কাটা গেলেই পুরোটা কাটার হুকুম দেওয়া হয়।

৫. উপসংহার (خاتمة): জবাই কেবল পশু হত্যা নয়, বরং এটি আল্লাহর দেওয়া জীবন হরণের একটি বৈধ প্রক্রিয়া, যা কেবল তাঁরই নাম নিয়ে সম্পন্ন করা যায়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত শর্তাবলি, বিশেষ করে ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার এবং বিসমিল্লাহর আবশ্যকতা প্রমাণ করে যে, ইসলাম পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং খাদ্যের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা উভয়কেই গুরুত্ব দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জনকারীর পশু হারাম হওয়ার বিধানটি মুমিনের তাওহীদি চেতনারই

বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন-৩৬: হারাম (পবিত্র এলাকা)-এর শিকার এবং ইহরামকারী ব্যক্তির শিকারের হুকুম কী? 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ পাখির শিকার সম্পর্কিত বিধান কী? (ما هو حكم صيد الحرم وصيد المحرم؟ وما هي الأحكام المتعلقة بصيد الطير في الفتاوى السراجية؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে পবিত্র স্থান এবং পবিত্র অবস্থার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। মক্কা মুকাররমার নির্দিষ্ট এলাকাকে 'হারাম' বা সম্মানিত এলাকা বলা হয়, যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ, গাছ কাটা এবং প্রাণী শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্যদিকে হজ বা ওমরা পালনের নিয়তে 'ইহরাম' বাঁধা ব্যক্তিও বিশেষ বিধিনিষেধের আওতায় থাকেন। 'আস-সায়দ' বা শিকার অধ্যায়ে এই দুটি অবস্থার বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে হারাম শরীফের পবিত্রতা রক্ষা এবং ইহরামকারীর জন্য শিকারের জরিমানার বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

২. ইহরামকারী ব্যক্তির শিকারের হুকুম (حكم صيد المحرم): যে ব্যক্তি হজ বা ওমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে (মুহরিম), তার জন্য শিকার করা **সম্পূর্ণ হারাম**, চাই সে হারামের ভেতরে থাকুক বা বাইরে (হিল এলাকায়)। আল্লাহ তাআলা বলেন: *"তোমাদের জন্য স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো।"* (সূরা মায়েদা: ৯৬)।

- **১. শিকার নিষিদ্ধ:** মুহরিম ব্যক্তি কোনো বন্য প্রাণী শিকার করতে পারবে না, শিকারীকে দেখিয়ে দিতে পারবে না, এমনকি শিকারে সাহায্যও করতে পারবে না।
- **২. গোশত খাওয়ার বিধান:** হানাফি মাযহাব মতে, মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার করলে তা তো হারাম হবেই (মৃত জন্তুতুল্য), এমনকি অন্য কেউ (মুহরিম নয় এমন ব্যক্তি) যদি মুহরিমের জন্য শিকার করে, তবে সেই গোশত খাওয়াও মুহরিমের জন্য হারাম।
- **৩. জরিমানা (জাযা):** যদি ইহরাম অবস্থায় কেউ শিকার হত্যা করে, তবে তার ওপর 'জাযা' বা জরিমানা ওয়াজিব হবে। জরিমানার পরিমাণ হলো—

ওই শিকার করা প্রাণীর সমমূল্য সদকা করা অথবা সমমানের একটি পশু হারামের সীমানায় কোরবানি করা।

- **৪. জলজ শিকার:** ইহরাম অবস্থায় সাগরের বা নদীর মাছ শিকার করা ও খাওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

৩. হারাম বা পবিত্র এলাকার শিকারের হুকুম (حكم صيد الحرم): মক্কা ও মদিনার নির্দিষ্ট সীমানাকে 'হারাম' বলা হয়। এই এলাকার বিধান মুহরিম এবং গায়রে মুহরিম (সাধারণ হালাল ব্যক্তি) সবার জন্য সমান।

- **বিধান:** হারামের সীমানার ভেতরে কোনো বন্য প্রাণী শিকার করা, তাড়ানো বা হত্যা করা **হারাম**। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছিলেন: *"এই শহরের কাঁটাযুক্ত গাছ কাটা যাবে না এবং এর শিকারী প্রাণীকে তাড়ানো যাবে না।"*

- **শাস্তি:** কেউ যদি হারামের ভেতরে শিকার করে, তবে প্রাণীটি মৃত বা হারাম গণ্য হবে এবং শিকারীর ওপর তার মূল্য জরিমানা (দাম) হিসেবে ওয়াজিব হবে। এই জরিমানা হারামের মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৪. 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ'-এ পাখির শিকার সম্পর্কিত বিধান: গ্রন্থটিতে পাখি শিকারের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ও সূক্ষ্ম মাসয়ালা (Furu') উল্লেখ করা হয়েছে, যা হারামের সীমানা ও ইহরামের সাথে সম্পর্কিত:

(ক) হারামের ভেতরের ও বাইরের পাখি:

- **বাইরে থেকে ভেতরে:** যদি কেউ হারামের সীমানার বাইরে (হিল) থেকে তীর মারে এবং পাখিটি হারামের ভেতরে থাকা অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যায়, তবে শিকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। কারণ শিকারটি হারামের নিরাপত্তা বা জিম্মায় ছিল।

- **ভেতর থেকে বাইরে:** যদি কেউ হারামের ভেতর থেকে তীর মারে এবং পাখিটি সীমানার বাইরে গিয়ে মারা যায়, তবুও জরিমানা দিতে হবে। কারণ শিকারী হারামের পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

(খ) মালিকানাধীন পাখি: যদি কোনো ব্যক্তি হারামের বাসিন্দা হয় এবং তার পোষা কবুতর বা পাখি থাকে যা তার ঘরে পালা হয়, তবে সেগুলো 'শিকার' (Sayd) এর

অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো জবাই করা বা খাওয়া জায়েয। কিন্তু হারামের মুক্ত কবুতর বা বন্য পাখি ধরা হারাম।

(গ) পাখির বাসা ও ডিম: 'সিরাজিয়া' অনুযায়ী, হারামের সীমানার ভেতরে গাছের ডালে থাকা পাখির বাসা ভাঙা, ডিম পাড়া বা ছানা ধরাও নিষিদ্ধ। যদি কেউ ডিম ভাঙে বা ছানা মারে, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ঘ) উড়ন্ত পাখির বিধান: যদি কোনো পাখি হারামের ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তাকে আকাশেও শিকার করা যাবে না। হারামের বাতাস বা আকাশও সম্মানের অন্তর্ভুক্ত।

৫. ক্ষতিকর প্রাণীর ব্যতিক্রম (আল-ফাওয়াসিক): যদিও হারামে শিকার নিষিদ্ধ, তথাপি কিছু ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করা সবার জন্য বৈধ। এগুলোকে হাদিসে 'ফাওয়াসিক' (দুষ্ট প্রাণী) বলা হয়েছে। এগুলো হলো ৫টি: ১. কাক (বিশেষত সাদা পিঠওয়ালা)। ২. চিল। ৩. বিছা/কাঁকড়াবিছা। ৪. ইঁদুর। ৫. হিংস্র কুকুর (বা কামড়াতে উদ্যত যেকোনো প্রাণী, যেমন সাপ)। এগুলো হত্যা করলে ইহরামকারী বা হারামে অবস্থানকারী কারো ওপর কোনো জরিমানা নেই।

৬. উপসংহার (خاتمة): হারাম শরীফ এবং ইহরামের অবস্থা—উভয়ই আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিদর্শন বা 'শাআইরুল্লাহ'। এই বিধানগুলোর মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব এবং সৃষ্টির প্রতি দয়ার শিক্ষা বদ্ধমূল করা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে পাখি ও শিকারের এই সূক্ষ্ম বিধানগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে চৌদ্দশ বছর আগেই এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। ইহরাম অবস্থায় নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি মশা বা পাখি মারার লোভ সংবরণ করাই হলো হজের প্রকৃত শিক্ষা।

الأضاحي : কুরবানী

প্রশ্ন-৩৭: শরীয়তের পরিভাষায় 'কুরবানী' (আল-উদ্বহিয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী মাযহাবে এর হুকুম কী এবং এর দলিল কী?
(عرف "الأضحية" شرعا - وما حكمها في المذهب الحنفي ودليله؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো কুরবানী। এটি মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর মহান ত্যাগের স্মৃতিবিজড়িত একটি ইবাদত। জিলহজ্ব মাসে নির্দিষ্ট পশু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'উদ্বহিয়্যাহ' বা কুরবানী বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এবং হানাফি ফিকহের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে কুরবানীর সংজ্ঞা, হুকুম এবং এর গুরুত্ব অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি কেবল পশু জবাই নয়, বরং এটি তাকওয়া ও আত্মত্যাগের এক অনন্য নিদর্শন।

২. কুরবানীর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الأضحية): 'উদ্বহিয়্যাহ' (الأضحية) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** 'উদ্বহিয়্যাহ' শব্দটি 'দুহা' (ضحى) বা 'উদ্বহাতুন' থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো চাশতের সময় বা পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানীর পশু সাধারণত ঈদের নামাযের পর বা চাশতের সময়ে জবাই করা হয়, তাই একে 'উদ্বহিয়্যাহ' বা কুরবানী বলা হয়। বাংলায় একে ত্যাগ বা বিসর্জনও বলা হয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে কুরবানীর সংজ্ঞা হলো: **" ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ."** অর্থ: *"আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে নির্দিষ্ট সময়ে (১০ থেকে ১২ জিলহজ্ব) নির্দিষ্ট পশু (চতুষ্পদ জন্তু) জবাই করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'উদ্বহিয়্যাহ' বা কুরবানী বলে।"*

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. পশু: উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা—এই নির্দিষ্ট পশুগুলো হতে হবে। ২. **সময়:** কুরবানীর দিনগুলোতে (আইয়্যামে নাহর) হতে হবে। ৩. **নিয়ত:** একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকতে হবে। গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকলে তা কুরবানী হবে না।

৩. হানাফী মাযহাবে কুরবানীর হুকুম (حكم الأضحية عند الحنفية): কুরবানীর হুকুম নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফি মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহগণ এবং ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর মতে: **"কুরবানী করা সামর্থ্যবান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) মুসলিম নর-নারীর ওপর 'ওয়াজিব' (আবশ্যক)।"** এটি কেবল সুন্নাত নয়, বরং ওয়াজিব। যদি কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি কুরবানী না করে, তবে সে গুনাহগার হবে।

- **অন্যান্য মাযহাবের সাথে পার্থক্য:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং জুমহুর উলামাদের মতে কুরবানী করা 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'। কিন্তু হানাফি মাযহাবে দলিলের ভিত্তিতে একে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪. কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দলিলসমূহ (أدلة الوجوب): হানাফি ফকীহগণ কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার স্বপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে শক্তিশালী দলিল পেশ করেন:

(ক) আল-কুরআন থেকে দলিল: আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"** অর্থ: *"অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন।"* (সূরা আল-কাউসার: ২)। **ব্যাখ্যা:** হানাফি উসুল অনুযায়ী, কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত 'আমর' বা নির্দেশসূচক শব্দ (ওয়ানহার - কুরবানী করুন) সাধারণত 'ওয়াজিব' বা আবশ্যকতা বোঝায়। আল্লাহ এখানে রাসুল (সা.) এবং তাঁর উম্মতকে নামাযের পাশাপাশি কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছেন।

(খ) আল-হাদিস থেকে দলিল: ১. রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: **" مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا"** অর্থ: *"যার কুরবানী করার সামর্থ্য আছে অথচ সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।"* (ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)। **ব্যাখ্যা:** ঈদগাহে আসতে নিষেধ করা একটি কঠোর ধমক (ওয়াইদ)। কোনো মুস্তাহাব বা সুন্নাত আমল তরক করলে নবীজি (সা.) এমন কঠোর ধমক দেন না। এই ধমক প্রমাণ করে যে, কুরবানী করা ওয়াজিব।

২. অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً"** অর্থ: *"হে লোকসকল! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের ওপর প্রতি বছর কুরবানী করা আবশ্যক।"* (আবু দাউদ)। এখানে 'আলা' (উপর আবশ্যক) শব্দটি ওয়াজিবের প্রমাণ।

(গ) যুক্তিভিত্তিক দলিল (الدليل العقلي): কুরবানী হলো জান ও মালের সদকা। ফিতরার সদকা (সদকাতুল ফিতর) যেমন জীবনের পবিত্রতার জন্য ওয়াজিব, তেমনি কুরবানীও নিজের জীবনের কাফফারা বা মুক্তিপণ হিসেবে ওয়াজিব। তাছাড়া এটি ইসলামের একটি মহান নিদর্শন (শাআইর), যা রক্ষা করা মুসলিম সমাজের সামর্থ্যবানদের ওপর আবশ্যক।

৫. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, কুরবানী কেবল একটি প্রথা নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের আলোকে এটি প্রমাণিত যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পালন হয় এবং গরিব-দুঃখীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। তাই কোনো সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য উচিত নয় কৃপণতা করে এই মহান ইবাদত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

প্রশ্ন-৩৮: মুসলমানের উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি কী কী? এবং কুরবানী করার নির্ধারিত সময়কাল কী?

ما هي شروط وجوب الأضحية على المسلم؟ وما هي الأوقات المحددة (لأدائها؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে প্রতিটি ইবাদতের জন্য কিছু পূর্বশর্ত বা 'শুরুত' রয়েছে। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে ইবাদত কারো ওপর আবশ্যক হয় না, আবার কারো আদায়ও হয় না। কুরবানীও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও হানাফি মাযহাবে কুরবানী ওয়াজিব, তথাপি তা সবার জন্য ঢালাওভাবে প্রযোজ্য নয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি এবং এর সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সঠিক সময়ে এবং সঠিক ব্যক্তির ওপর কুরবানী আদায় করা শরীয়তের বিধান।

২. কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি (شروط وجوب الأضحية): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য ৬টি মৌলিক শর্ত পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

(ক) মুসলিম হওয়া (الإسلام): কুরবানী একটি ইবাদত, আর ইবাদত কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হলো ঈমান। তাই অমুসলims বা কাফেরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয় এবং তারা করলে তা শরীয়তসম্মত কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে না।

(খ) স্বাধীন হওয়া (الحرية): ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। দাস-দাসীর ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, কারণ তাদের নিজস্ব কোনো মালিকানা নেই; তারা যা উপার্জন করে তা তাদের মনিবের।

(গ) মুকিম বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া (الإقامة): ব্যক্তিকে অবশ্যই 'মুকিম' হতে হবে। অর্থাৎ, সে নিজ বাড়িতে অবস্থান করছে অথবা সফর অবস্থায় ১৫ দিনের বেশি কোথাও থাকার নিয়ত করেছে।

- **মুসাফিরের বিধান:** যে ব্যক্তি শরয়ী সফরে (৪৮ মাইলের বেশি দূরত্বে) আছে, তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কারণ কুরবানী সংগ্রহ ও জবাই করা সফরের মধ্যে কষ্টকর। তবে মুসাফির যদি নফল হিসেবে কুরবানী দেয়, তা আদায় হবে এবং সওয়াব পাবে।

(ঘ) সামর্থ্যবান হওয়া বা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া (الغنى/اليسار): এটি কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর দিনগুলোতে (১০, ১১ ও ১২ জিলহজ্ব) তার নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ ও ঋণের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসার পণ্য বা প্রয়োজনাতিরিক্ত আসবাবপত্র থাকে, তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব।

- **যাকাতের নিসাবের সাথে পার্থক্য:** যাকাতের ক্ষেত্রে সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া (হাওলানে হাওল) শর্ত, কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। কুরবানীর দিনগুলোতে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। এমনকি কারো যদি ব্যবসার মাল না থাকে কিন্তু ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত দামী আসবাব বা জমি থাকে, তাহলেও হানাফি মতে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব।

(ঙ) প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান হওয়া (العقل والبلوغ): হানাফি মাযহাবের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত (মুফতা বিহি কওল) হলো—কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) ও আকিল (সুস্থ মস্তিষ্ক) হতে হবে।

- **শিশুর বিধান:** ধনী শিশুর মাল থেকে তার অভিভাবকের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। ইমাম কুদুরী ও ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) এই মতটিই গ্রহণ

করেছেন। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, পিতার ওপর ধনী শিশুর পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু ফতোয়া প্রথম মতের ওপরই।

৩. কুরবানী করার নির্ধারিত সময়কাল (أوقات الأضحية): কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা ফরজ। সময়ের আগে বা পরে জবাই করলে তা কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে না, বরং সাধারণ সদকা বা জবেহ হবে।

(ক) কুরবানীর দিনসমূহ (أيام النحر): হানাফি মাযহাব মতে কুরবানীর সময় হলো **তিন দিন:** ১. ১০ই জিলহজ্ব (ঈদুল আযহার দিন)। ২. ১১ই জিলহজ্ব। ৩. ১২ই জিলহজ্ব (সূর্যাস্ত পর্যন্ত)। অর্থাৎ, জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানী করা যায়। তবে প্রথম দিন (১০ তারিখ) কুরবানী করা সবচেয়ে উত্তম, এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন।

- **শাফেয়ী মত:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ১৩ই জিলহজ্ব পর্যন্ত মোট চার দিন কুরবানী করা যায়। কিন্তু হানাফি ফিকহে সতর্কতা হিসেবে তিন দিনই ধার্য করা হয়েছে।

(খ) কুরবানী শুরু করার সময়: কুরবানী কখন শুরু করা যাবে, তা নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থানের ওপর:

- **শহরের বাসিন্দাদের জন্য:** যারা শহরে বা এমন জায়গায় বাস করে যেখানে ঈদের নামায ও খুতবা হয়, তাদের জন্য ঈদের নামায ও খুতবা শেষ হওয়ার আগে কুরবানী করা জায়েয নেই। যদি কেউ ঈদের নামাযের আগে জবাই করে, তবে তা কুরবানী হবে না; তাকে পুনরায় কুরবানী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যে ব্যক্তি নামাযের আগে জবাই করল, সে নিজের জন্য গোশত খেল (কুরবানী হলো না)।"*

- **গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য:** যারা এমন গ্রামে বাস করে যেখানে ঈদের জামাত ওয়াজিব নয় বা হয় না, তারা ১০ই জিলহজ্ব ফজর উদয় হওয়ার পর থেকেই কুরবানী করতে পারবে। তবে তাদের জন্যও সূর্য ওঠার পর জবাই করা উত্তম।

(গ) রাতে কুরবানী করার বিধান: ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানী করা জায়েয, তবে হানাফি মতে আলো-স্বল্পতার কারণে রগ কাটতে ভুল হওয়ার আশঙ্কায়

তা **মাকরূহ তানযিহি**। তবে যদি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকে এবং সঠিকভাবে জবাই করা সম্ভব হয়, তবে মাকরূহ হবে না।

৪. সময় চলে গেলে করণীয়: যদি কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি এই তিন দিনের মধ্যে কুরবানী করতে না পারে, তবে:

- যদি পশু কেনা থাকে, তবে সেই পশুটি জীবিত সদকা করে দিতে হবে।
- যদি পশু কেনা না থাকে, তবে একটি ছাগল বা ভেড়ার মূল্য গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।

৫. উপসংহার (خاتمة): কুরবানীর বিধানাবলী প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। মুসাফির ও দরিদ্রকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, আবার ধনীদের ওপর তা আবশ্যক করা হয়েছে। একইসাথে সময়ের সুনির্দিষ্টতা—বিশেষ করে ঈদের নামাযের পর জবাই করার শর্ত—মুসলিম উম্মাহর শৃঙ্খলা ও ঐক্যের প্রতীক। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে এই সময়সীমা ও শর্তাবলি মেনে কুরবানী করাই হলো তাকওয়ার দাবি।

প্রশ্ন-৩৯: হানাফী মাযহাবে কুরবানীতে অংশগ্রহণের (শরীক হওয়ার) বিধান ব্যাখ্যা কর। গরু ও উটে অংশগ্রহণের সীমা কতটুকু?

اشرح أحكام الاشتراك في الأضحية في المذهب الحنفي - وما هو حدود المشاركة في البقر والإبل؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): কুরবানী ইসলামি শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। কুরবানী আদায় করার ক্ষেত্রে পশু নির্বাচন একটি মৌলিক বিষয়। শরীয়ত কিছু পশুর ক্ষেত্রে এককভাবে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছে, আবার কিছু বড় পশুর ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণে বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (শাকাতে) কুরবানী করার অনুমতি দিয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের অন্যান্য গ্রন্থে এই অংশীদারিত্বের বা 'ইশতিরাক'-এর বিধান অত্যন্ত বিস্তারিত ও সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে। কুরবানী কবুল হওয়ার জন্য এই বিধানগুলো জানা এবং মানা অপরিহার্য।

২. কুরবানীতে অংশীদারিত্বের ধরণ (أنواع الاشتراك): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী পশুর ধরণভেদে অংশীদারিত্ব দুই প্রকার:

(ক) ছোট পশু (ছাগল, ভেড়া, দুম্বা): ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অংশীদারিত্ব বা শরিকানা চলে না। একটি ছাগল বা ভেড়া কেবল **একজন ব্যক্তির** পক্ষ থেকেই কুরবানী করা জায়েয। যদি একাধিক ব্যক্তি মিলে একটি ছাগল কুরবানী করে, তবে কারো কুরবানীই আদায় হবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"একটি ছাগল এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যথেষ্ট।"*

(খ) বড় পশু (উট, গরু, মহিষ): বড় পশুর ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণ বা শরিক হওয়া জায়েয। শরীয়ত উট, গরু ও মহিষকে 'বদনা' বা বড় পশুর অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এতে সর্বোচ্চ সাতজন পর্যন্ত শরিক হওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

৩. গরু ও উটে অংশগ্রহণের সীমা (حدود المشاركة في البقر والإبل): হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, উট, গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সীমা নিম্নরূপ:

- **সর্বোচ্চ সংখ্যা:** একটি গরু, মহিষ বা উটে সর্বোচ্চ **৭ জন** ব্যক্তি শরিক হতে পারবে। সাতের অধিক (যেমন ৮ জন) হলে কারো কুরবানী আদায় হবে না।
- **সর্বনিম্ন সংখ্যা:** সাত জন হওয়া জরুরি নয়। সাতের কম যেকোনো সংখ্যা (যেমন—২, ৩, ৪, ৫ বা ৬ জন) মিলে কুরবানী করলে তা জায়েয হবে। এমনকি এক ব্যক্তি একাই একটি পুরো গরু বা উট কুরবানী করতে পারবে, এতে সওয়াব বেশি হবে।
- **দলিল:** জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: *"আমরা হুদাইবিয়ার বছর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কুরবানী করেছি—একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে।"* (সহিহ মুসলিম)।

৪. কুরবানীতে শরিক হওয়ার বা অংশগ্রহণের শর্তাবলি (شروط صحة الاشتراك): বড় পশুতে শরিকানা জায়েয হওয়ার জন্য হানাফি ফিকহে কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই শর্তগুলো লঙ্ঘিত হলে সমস্ত শরিকের কুরবানী বাতিল হয়ে যাবে। শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) নিয়ত বা উদ্দেশ্য (النية): সকল শরিকের উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন বা ইবাদত (কুরবাত)।

- **মাংস খাওয়ার নিয়ত:** যদি সাত জন শরিকের মধ্যে একজনের নিয়তও এমন হয় যে, "আমি কেবল গোশত খাওয়ার জন্য শরিক হলাম, সওয়াবের জন্য নয়", তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ওই একজনসহ বাকি ছয় জনের কুরবানীও **বাতিল** হয়ে যাবে। কারণ, রক্ত প্রবাহিত করা (জবাই) অবিভাজ্য। যখন এর একাংশ ইবাদত হিসেবে গণ্য হলো না, তখন পুরো জবাইটিই ইবাদত থেকে খারিজ হয়ে গেল।

- **ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতের নিয়ত:** সকল শরিকের নিয়ত হুবহু 'কুরবানী' হতে হবে, এমনটি জরুরি নয়। বরং উদ্দেশ্য 'আল্লাহর নৈকট্য' (তাকাররুব) হলেই চলবে। সুতরাং, কেউ কুরবানী, কেউ আকিকা, কেউ মান্নত, আবার কেউ কাজা কুরবানীর নিয়তে এক গরুতে শরিক হলে সবার কুরবানী **শুদ্ধ** হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এটি জায়েয।

(খ) শরিকদের ধর্ম বিশ্বাস: সকল শরিককে অবশ্যই **মুসলিম** হতে হবে। যদি শরিকদের মধ্যে কেউ অমুসলিম বা কাফের হয়, তবে কারো কুরবানী শুদ্ধ হবে না। কারণ কাফেরের কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না।

(গ) শেয়ার বা অংশের পরিমাণ: প্রত্যেক শরিকের অংশ বা শেয়ার পশুটির মোট মূল্যের এক-সপ্তমাংশ (১/৭) বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে।

- **১/৭-এর কম হওয়া:** যদি কারো অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয়, তবে তার কুরবানী আদায় হবে না এবং তার কারণে অন্য শরিকদের কুরবানীও নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন—একটি গরুতে ৮ জন শরিক হওয়া অথবা কারো শেয়ার ৫০০ টাকা হওয়া যেখানে ১/৭ অংশ হয় ১০০০ টাকা।

(ঘ) হালাল উপার্জন: সকল শরিকের উপার্জন হালাল হতে হবে। যদি কারো টাকা হারাম (যেমন—সুদ বা ঘুষের টাকা) হয় এবং সে তা দিয়ে কুরবানীতে শরিক হয়, তবে হানাফি ফিকহের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সমস্ত শরিকের কুরবানী বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না।

৫. গোশত বণ্টনের বিধান (أحكام توزيع اللحم): শরিকানা কুরবানীর ক্ষেত্রে গোশত বণ্টন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- **ওজন করে বণ্টন:** হানাফি মাযহাব মতে, শরিকদের মধ্যে গোশত অবশ্যই পাল্লা দিয়ে মেপে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে।

- **অনুমান করা নিষিদ্ধ:** কেবল অনুমানের ভিত্তিতে (তাহাররি) বা চোখের দেখায় ভাগ করা জায়েয নেই। কারণ এতে কারো ভাগে কম বা বেশি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, যা রিবা বা সুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

- **ব্যতিক্রম:** তবে যদি গোশতের সাথে মাথা, পায়া বা চামড়া কোনো এক ভাগে দিয়ে দেওয়া হয়, তবে অনুমান করে বণ্টন করা জায়েয হতে পারে (শর্তসাপেক্ষে)। কিন্তু ওজন করাই নিরাপদ ও সুন্নাহসম্মত।

৬. বিশেষ মাসয়ালা (مسائل متفرقة):

- **মৃত ব্যক্তির পক্ষে:** মৃত ব্যক্তির সওয়াবের নিয়তে শরিক হওয়া জায়েয।

- **রাসুল (সা.)-এর পক্ষে:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী বা আকিকার নিয়তে শরিক হওয়া অত্যন্ত উত্তম কাজ।

- **জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী:** কুরবানীর গরুতে কারো জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর ভোজের জন্য অংশ নেওয়া জায়েয নেই। এতে সবার কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে।

৭. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, হানাফি মাযহাবে কুরবানীতে অংশগ্রহণের বিধানগুলো অত্যন্ত যৌক্তিক এবং সামজিক সংহতির প্রতীক। উট বা গরুতে সাত জন পর্যন্ত শরিক হওয়ার অনুমতি থাকলেও নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং হালাল উপার্জনের শর্ত একে একটি নির্ভেজাল ইবাদতে পরিণত করে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে বর্ণিত হয়েছে যে, শরিক নির্বাচনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ 'এক ফোটা লেবু যেমন পুরো দুধ নষ্ট করে দেয়', তেমনি একজন শরিকের ভুল নিয়ত বা হারাম টাকা বাকি সবার আমল ধ্বংস করে দিতে পারে।

প্রশ্ন-৪০: পশুর মধ্যে এমন কী কী দোষ থাকলে তার দ্বারা কুরবানী করা নিষেধ? কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর দোষ প্রকাশ পেলে এর বিধান কী?
(ما هي العيوب التي تمنع من التضحية بالحيوان؟ وما هي الأحكام المتعلقة بالأضحية إذا ظهر العيب بعد التعيين؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): কুরবানী হলো মহান আল্লাহর দরবারে বান্দার পক্ষ থেকে একটি তোহফা বা উপহার। আর উপহার সবসময় ত্রুটিমুক্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: *"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় করবে।"* তাই কুরবানীর পশু হতে হবে সুস্থ, সবল এবং বড় ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও ফিকহী গ্রন্থগুলোতে কুরবানীর পশুর দোষ-ত্রুটি বা 'আইব' সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা কুরবানীর শুদ্ধতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

২. কুরবানী নিষেধকারী দোষ-ত্রুটিসমূহ (العيوب المانعة من الأضحية): রাসুলুল্লাহ (সা.) হাদিসে স্পষ্টভাবে চারটি দোষের কথা উল্লেখ করেছেন যা থাকলে কুরবানী জায়েয হবে না। ফকীহগণ এর ওপর কিয়াস করে আরও কিছু দোষ যুক্ত করেছেন। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী যে দোষগুলো থাকলে কুরবানী আদায় হয় না, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি (অন্ধত্ব):

- যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ।
- অথবা যে পশুর একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ।
- অথবা যে পশুর এক চোখের দৃষ্টিশক্তি এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি নষ্ট হয়ে গেছে।

(খ) শারীরিক অক্ষমতা বা খোড়া প্রাণী:

- যে পশু এমন খোড়া বা ল্যাংড়া যে নিজে হেঁটে জবাই করার স্থান (মাজবাহ) পর্যন্ত যেতে পারে না, তার দ্বারা কুরবানী জায়েয নেই।
- যদি খোড়া হয় কিন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং চতুর্থ পা মাটিতে রাখতে পারে বা সামান্য ভর দিতে পারে, তবে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয (তবে মাকরূহ)।

(গ) রুগ্নতা ও দুর্বলতা:

- যে পশু অত্যধিক রোগাক্রান্ত।
- যে পশু এত বেশি দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ যে তার হাড়ে মজ্জা বা মগজ নেই (হাড় শুকিয়ে গেছে)। রাসুল (সা.) একে 'আল-কাসির' বলেছেন। এমন পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

(ঘ) অঙ্গহানি (কান বা লেজ কাটা):

- যে পশুর কান বা লেজ জন্মগতভাবেই নেই, তার দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।
- যে পশুর কান বা লেজের অধিকাংশ (অর্ধেকের বেশি, মতান্তরে এক-তৃতীয়াংশের বেশি) কাটা গেছে, তার দ্বারা কুরবানী হবে না। হানাফি ফিকহে **এক-তৃতীয়াংশের বেশি** কাটা থাকাকেই মানদণ্ড ধরা হয়।

(ঙ) দাঁত না থাকা:

- যে পশুর জন্মগতভাবে দাঁত নেই অথবা অধিকাংশ দাঁত পড়ে গেছে যার ফলে সে ঘাস চিবিয়ে খেতে পারে না, এমন পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

(চ) শিং ভাঙা:

- জন্মগতভাবে শিং না থাকলে কুরবানী জায়েয (যেমন—মহিষ বা কিছু জাতের গরু)।
- কিন্তু যদি শিং থাকে এবং তা মূল বা গোড়া থেকে ভেঙে যায় যার প্রভাব মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায়, তবে তা দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়। কেবল ওপর থেকে শিং ভাঙলে বা ফেটে গেলে কুরবানী জায়েয।

(ছ) অন্যান্য ত্রুটি:

- যে পশুর স্তন কাটা বা শুকিয়ে গেছে (যা দ্বারা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারে না)।
- যে পশুর নাক কাটা।
- উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট পশু (খুনসা)।

৩. যে সকল ত্রুটি থাকলেও কুরবানী জায়েয (দোষগুলো মাকরূহ): কিছু ত্রুটি আছে যা থাকলে কুরবানী আদায় হয়ে যায়, তবে ত্রুটিমুক্ত পশু কুরবানী করা উত্তম। যেমন:

- পশুটি পাগল (মাজ ব্যবস্থায় ঠিক থাকলে)।
- পশুর শরীরে চর্মরোগ বা খুজলি আছে কিন্তু পশুটি মোটা-তাজা।
- কান বা লেজ সামান্য ফাটা বা ছিদ্র করা।

- পশুটি খাসি বা অণ্ডকোষহীন (Castrated)। এটি কোনো দোষ নয়, বরং খাসির গোশত সুস্বাদু হওয়ায় এটি কুরবানীর জন্য উত্তম। রাসুল (সা.) দুটি খাসি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন।

৪. কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর দোষ প্রকাশ পেলে বিধান (حكم حدوث العيب بعد التعيين): যদি কেউ একটি সুস্থ পশু কিনে আনে বা কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করে, কিন্তু পরে জবাইয়ের আগে পশুটির মধ্যে বড় কোনো দোষ (যেমন পা ভেঙে যাওয়া বা চোখ অন্ধ হওয়া) দেখা দেয়, তবে তার হুকুম ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। হানাফি ফিকহে ধনী ও গরিবের বিধানে পার্থক্য রয়েছে:

(ক) ধনী বা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে: যে ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব (নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক), সে যদি সুস্থ পশু কেনার পর তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, তবে তাকে **অবশ্যই আরেকটি সুস্থ পশু কিনে কুরবানী করতে হবে**।

- **কারণ:** ধনী ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তার সম্পদের কারণে, নির্দিষ্ট কোনো পশুর কারণে নয়। তাই তার জিম্মায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত পশু উৎসর্গ করার দায় (Dayn) রয়ে গেছে। ত্রুটিযুক্ত পশুটি সেই দায় শোধ করতে পারে না।

- **ব্যতিক্রম:** যদি সে দ্বিতীয়টি কেনার আগেই প্রথমটি (ত্রুটিযুক্ত অবস্থায়) জবাই করে ফেলে, তবে তা আদায় হবে না। কিন্তু যদি দ্বিতীয়টি কেনার পর প্রথমটি সুস্থ হয়ে যায়, তবে যেকোনো একটি জবাই করলেই চলবে (উত্তম হলো যেটি উত্তম সেটি জবাই করা)।

(খ) দরিদ্র বা অভাবী ব্যক্তির ক্ষেত্রে: যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু সে সওয়াবের আশায় একটি সুস্থ পশু কিনেছে এবং পরে তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে, সে **ওই ত্রুটিযুক্ত পশুটিই কুরবানী করতে পারবে**। তাকে নতুন পশু কিনতে হবে না।

- **কারণ:** গরিবের ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না। সে যখন পশুটি কিনল, তখন সে নির্দিষ্ট পশুটিকেই আল্লাহর জন্য মান্নত বা নির্ধারণ করল। গরিবের জন্য এটিই তার সর্বোচ্চ সামর্থ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না।" তাই তার ক্ষেত্রে ওই পশুটিই যথেষ্ট।

(গ) জবাইয়ের সময়ের ত্রুটি: পশুকে শোয়ানোর সময় বা জবাই করার ধস্তাধস্তির সময় যদি পশুর পা ভেঙে যায় বা চোখে আঘাত লাগে, তবে তাতে কোনো সমস্যা

নেই। ওই অবস্থায় জবাই করলে কুরবানী **শুদ্ধ** হবে। কারণ এটি জবাই প্রক্রিয়ার অংশ এবং এটি এড়ানো কঠিন।

৫. উপসংহার (خاتمة): কুরবানীর পশু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শরীয়ত যে মানদণ্ড দিয়েছে, তার মূল শিক্ষা হলো—আল্লাহর জন্য তুচ্ছ বা অকেজো জিনিস নয়, বরং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সেরা জিনিসটি উৎসর্গ করা। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে দেখা যায়, ধনী ও গরিবের বিধানে যে পার্থক্য করা হয়েছে, তা ইসলামি ফিকহের নমনীয়তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। দোষমুক্ত পশু কুরবানী করা কেবল ওয়াজিব আদায়ের শর্তই নয়, বরং এটি অন্তরের তাকওয়ারও পরীক্ষা।

القضاء : বিচারব্যবস্থা

প্রশ্ন-৪১: শরীয়তের পরিভাষায় 'বিচারব্যবস্থা' (আল-ক্বাযা)-এর সংজ্ঞা দাও। ইসলামে বিচার ব্যবস্থার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
(عرف "القضاء" شرعا - وما هي الحكمة من مشروعية القضاء في الإسلام؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামে 'বিচার ব্যবস্থা' বা 'আল-ক্বাযা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দায়িত্ব। এটি নবীদের সুন্নাত এবং মহান আল্লাহর গুণাবলীর (আল-হাকাম, আল-আদিল) একটি প্রতিফলন। বিচারকার্য পরিচালনা করা ফরযে কিফায়া এবং এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের অন্যান্য গ্রন্থে বিচারকের যোগ্যতা, দায়িত্ব এবং বিচার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মজলুমের অধিকার আদায় এবং জালিমের হাত প্রতিহত করার একমাত্র বৈধ মাধ্যম হলো এই বিচার ব্যবস্থা।

২. বিচারব্যবস্থার পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف القضاء): 'আল-ক্বাযা' (القضاء) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** 'ক্বাযা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—ফয়সালা করা, চূড়ান্ত করা, আদেশ দেওয়া বা কোনো কাজ সমাপ্ত করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **"وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ"** অর্থাৎ, "আপনার রব ফয়সালা দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না।" (সূরা বনী ইসরাইল: ২৩)।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে বিচার ব্যবস্থার সংজ্ঞা হলো: **" هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ."** অর্থ: *"শরীয়তসম্মত বিশেষ পন্থায় বিবাদমান দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ নিরসন করা এবং হকদারের অধিকার নিশ্চিত করাকে 'ক্বাযা' বা বিচার কার্য বলে।"*

অন্য সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: **"إِلْزَامٌ ذِيْ وِلَايَةٍ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ."** অর্থ: *"শরয়ী হুকুমের মাধ্যমে কর্তৃত্ববান ব্যক্তি কর্তৃক (বিবাদীকে) কোনো কিছু মেনে নিতে বাধ্য করা।"*

৩. বিচার ব্যবস্থার শরয়ী হুকুম (الحكم الشرعي): ইসলামে বিচারক নিয়োগ করা এবং বিচারকার্য পরিচালনা করা **'ফরযে কিফায়া'**। অর্থাৎ সমাজের কিছু লোক বা

রাষ্ট্র যদি এই দায়িত্ব পালন করে, তবে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউই এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে পুরো সমাজ গুনাহগার হবে। তবে যদি কোনো এলাকায় বিচার করার মতো যোগ্য ব্যক্তি মাত্র একজনই থাকেন, তবে তার জন্য এই দায়িত্ব গ্রহণ করা **'ফরযে আইন'** বা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

৪. বিচার ব্যবস্থার দলিল (الأدلة):

- **আল-কুরআন:** আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন: *"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করো।"* (সূরা সাদ: ২৬)।
- **আল-হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যে ব্যক্তিকে মানুষের মাঝে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হলো, তাকে যেন ছুরি ছাড়া জবেহ করা হলো।"* (অর্থাৎ এটি অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব)।

৫. ইসলামে বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও হিকমত (الحكمة من مشروعية القضاء):

আল্লাহ তাআলা বিচার ব্যবস্থাকে কেন বিধিবদ্ধ করেছেন, তার পেছনে বহুবিধ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য বা 'হিকমত' রয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও উসুলবিদদের মতে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা (إقامة العدل): আসমান ও জমিন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিচার ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ধনী-দরিদ্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা। আল্লাহ বলেন: *"নিশ্চই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।"* (সূরা নাহল: ৯০)।

(খ) মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া (رد الحقوق إلى أهلها): শক্তিশালী ব্যক্তিরা যাতে দুর্বলের সম্পদ বা অধিকার হরণ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করাই বিচারকের কাজ। বিচারক রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে জালিমের হাত থেকে মজলুমের পাওনা আদায় করে দেন। এটি না থাকলে সমাজে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি কায়েম হতো।

(গ) সমাজে ফিতনা-ফাসাদ রোধ করা (دفع الفساد): মানুষের স্বভাব হলো লোভ ও স্বার্থপরতা। বিচার ব্যবস্থা না থাকলে প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার আদায়ের জন্য নিজেই আইন হাতে তুলে নিত, ফলে সমাজে রক্তপাত ও অরাজকতা (ফাসাদ) সৃষ্টি হতো। বিচারালয় বা আদালত সেই অরাজকতা বন্ধ করে বিবাদ মেটানোর একটি শান্তিময় পথ বাতলে দেয়।

(ঘ) আল্লাহর হুদুদ বা শাস্তি কার্যকর করা (إقامة الحدود): চুরি, যিনা, মদ্যপান বা অপবাদের মতো অপরাধের শাস্তি (হদ) কার্যকর করা বিচারকের দায়িত্ব। এর মাধ্যমে সমাজ অপরাধমুক্ত থাকে এবং অন্যরা অপরাধ করতে ভয় পায়। এই হুদুদ কায়েম করা আল্লাহর জমিনে রহমতস্বরূপ।

(ঙ) আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার: বিচার ব্যবস্থা হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের সর্বোচ্চ পর্যায়। বিচারক তার রায়ের মাধ্যমে অন্যায়কে দমন করেন এবং সত্যকে বিজয়ী করেন।

(চ) দুর্বল ও অসহায়দের নিরাপত্তা: এতিম, বিধবা, পাগল বা নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের অভিভাবকত্ব নিশ্চিত করা বিচার ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিচারক হলেন তাদের অভিভাবক যাদের কোনো অভিভাবক নেই।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, বিচার ব্যবস্থা বা 'আল-ক্বাযা' হলো ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের মেরুদণ্ড। এটি কোনো সাধারণ পেশা নয়, বরং এটি নবুয়তের দায়িত্বের উত্তরাধিকার। এর উদ্দেশ্য কেবল বিবাদ মেটানো নয়, বরং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। হানাফি ফিকহে বিচার ব্যবস্থাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারকের এক মুহূর্তের ইনসাফকে সারারাতের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। তাই 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পঠিত হয়।

প্রশ্ন-৪২: হানাফীদের মতে বিচারককে নিয়োগ দেওয়ার শর্তাবলি কী কী? বিচারকের জন্য মুজতাহিদ হওয়া কি শর্ত?

ما هي شروط تولية القاضي عند الحنفية؟ وهل يشترط في القاضي أن يكون (مجتهدا؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): বিচারকের আসন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা যোগ্যতম ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতেন। যেহেতু বিচারক মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের ফয়সালা করেন, তাই তার মধ্যে বিশেষ কিছু যোগ্যতা বা গুণাবলী থাকা আবশ্যক। ইসলামী ফিকহে এই যোগ্যতাগুলোকে 'শুরুত' বা শর্ত বলা হয়। তবে বিচারক কি মুজতাহিদ (যিনি কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি বিধান বের করতে পারেন) হতে হবে, নাকি সাধারণ

আলেম হলেও চলবে—এ নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।

২. বিচারক নিয়োগের শর্তাবলি (شروط القاضي): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিচারকের যোগ্যতা বা শর্তগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ক. শুরুতে সিহহাত (বৈধ হওয়ার শর্ত)। খ. শুরুতে আউলাউইয়্যাহ (উত্তম হওয়ার শর্ত)।

(ক) আবশ্যকীয় শর্ত বা বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ: একজন ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিলে তার নিয়োগ বৈধ বা কার্যকর হওয়ার জন্য হানাফি মতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকতেই হবে:

- **১. ইসলাম (মুসলিম হওয়া):** বিচারককে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের বিচার বা রায় মুসলিমের ওপর কার্যকর নয়। তবে অমুসলিমরা নিজেদের মধ্যকার বিবাদ মেটানোর জন্য নিজেদের বিচারক নিয়োগ করতে পারে।

- **২. আকল (সুস্থ মস্তিষ্ক):** বিচারককে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বা বিবেকবান হতে হবে। পাগল বা মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তির নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে।

- **৩. বুলুগ (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া):** বিচারককে বালেগ হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর বিচারকার্য গ্রহণযোগ্য নয়।

- **৪. হুররিয়াত (স্বাধীন হওয়া):** বিচারককে স্বাধীন হতে হবে। পরাধীন বা দাসের সাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তার বিচারও গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) শারীরিক ও বাস্তবিক যোগ্যতার শর্ত:

- **৫. বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি:** বিচারককে বোবা, বধির বা পুরোপুরি অন্ধ হওয়া যাবে না। কারণ, বাদী-বিবাদীর কথা শোনা, তাদের স্বীকারোক্তি বোঝা এবং ইশারা বা প্রমাণ দেখার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলোর সুস্থতা অপরিহার্য। তবে সামান্য দুর্বলতা থাকলে সমস্যা নেই।

(গ) চারিত্রিক শর্ত (আদালাত বা ন্যায়পরায়ণতা):

- **ন্যায়পরায়ণতা:** বিচারককে 'আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ এবং পরহেজগার হওয়া উত্তম। তবে হানাফি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মত হলো—যদি ফাসিক (পাপী) ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে তার নিয়োগ বাতিল হবে না এবং তার রায় কার্যকর হবে, যতক্ষণ না সে শরীয়ত বিরোধী রায় দেয়। তবে ফাসিককে নিয়োগ দেওয়া গুনাহের কাজ এবং নিয়োগকারী শাসকের জন্য এটি অনুচিত।

৩. বিচারকের জন্য মুজতাহিদ হওয়া কি শর্ত? (هل الاجتهاد شرط؟): এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী মাসয়ালা, যেখানে হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

(ক) শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মত: ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং হাম্বলী মাযহাবের মতে, বিচারক হওয়ার জন্য 'মুজতাহিদ' হওয়া অপরিহার্য শর্ত। অর্থাৎ, বিচারককে অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে সরাসরি মাসয়ালা বের করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তাদের মতে, মুকাল্লিদ (যিনি অন্যের অনুসরণ করেন) বিচারক হতে পারেন না।

(খ) হানাফি মাযহাবের মত (আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া অনুযায়ী): ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফকীহগণের মতে, **বিচারক হওয়ার জন্য 'মুজতাহিদ' হওয়া শর্ত নয়।** বরং একজন 'মুকাল্লিদ' (যিনি মুজতাহিদের ফতোয়া অনুসরণ করেন) ব্যক্তিও বিচারক হতে পারেন।

- **হানাফীদের যুক্তি ও দলিল: ১. বাস্তবতা:** সাহাবায়ে কেরামের যুগেও অনেক বিচারক ছিলেন যারা মুজতাহিদ ছিলেন না, বরং বড় সাহাবীদের (যেমন ওমর, আলী রা.) ফতোয়া অনুযায়ী বিচার করতেন। ২. **মুজতাহিদের অভাব:** পরবর্তী যুগগুলোতে মুজতাহিদ স্তরের আলেম পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যদি ইজতিহাদকে শর্ত করা হয়, তবে বিচারকার্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের অধিকার নষ্ট হবে। শরীয়ত মানুষের সুবিধার জন্য, কষ্টের জন্য নয়। ৩. **অন্যের সাহায্য নেওয়া:** বিচারক নিজে মুজতাহিদ না হলে তিনি এলাকার বিজ্ঞ মুফতি বা ফকীহদের (আসহাবুল ফাতওয়া) সাথে পরামর্শ করে বা নির্ভরযোগ্য কিতাব দেখে রায় দিতে পারেন। ৪. **শর্তের ধরণ:** হানাফীদের মতে, ইজতিহাদ হলো 'কামাল' বা পূর্ণতার শর্ত, 'সিহহাত' বা বৈধতার শর্ত

নয়। অর্থাৎ বিচারক মুজতাহিদ হলে তা সবচেয়ে উত্তম (নুরুন আলা নুর), কিন্তু না হলে নিয়োগ বাতিল হবে না।

৪. বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি: বিচারককে অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধান (ইমাম বা খলিফা) বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হবে। কেউ নিজেকে নিজে বিচারক ঘোষণা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. নারী বিচারক নিয়োগের মাসয়ালা: হানাফি মাযহাব মতে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন—লেনদেন, বিয়ে-শাদি), সেসব ক্ষেত্রে নারীকে বিচারক নিয়োগ করা জায়েয। তবে হুদুদ ও কিসাসের মামলায় নারী বিচারক হতে পারবে না। পক্ষান্তরে জুমহুর উলামাদের মতে, নারী কোনো ক্ষেত্রেই বিচারক হতে পারবে না।

৬. উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হানাফি ফিকহে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে আদর্শ এবং বাস্তবতার মধ্যে চমৎকার সমন্বয় করা হয়েছে। যদিও জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ইজতিহাদ বিচারকের জন্য কাম্য গুণ, কিন্তু বিচার ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে এবং মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মুজতাহিদ হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ফতোয়া সংকলিত হয়েছে, যাতে মুফতি ও বিচারকরা হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত মতের ওপর ভিত্তি করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারেন।

প্রশ্ন-৪৩: হানাফী ফিকহে বিচারিক ফয়সালার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিগুলো কী কী (যেমন: স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ)? এবং সেগুলোর তদন্ত কীভাবে করা হয়?
(ما هي طرق الحكم القضائي المعتمدة في الفقه الحنفي (كالإقرار والبينة)؟ وكيف يتم التحقيق فيها؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক (কাজী) নিজের মনগড়া ধারণার ওপর ভিত্তি করে রায় দিতে পারেন না। সত্য উদঘাটন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শরীয়ত সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি বা 'প্রমাণের মাধ্যম' নির্ধারণ করে দিয়েছে। এগুলোকে ফিকহের পরিভাষায় 'হুজ্জাত' বা দলিল বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের গ্রন্থগুলোতে বিচারিক ফয়সালার পদ্ধতি এবং সাক্ষীদের সত্যতা যাচাই বা তদন্ত প্রক্রিয়া (তাযকিয়াহ) অত্যন্ত গুরুত্বের

সাথে আলোচিত হয়েছে। বিচারকের মূল কাজ হলো এই মাধ্যমগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করে হকের ফয়সালা করা।

২. বিচারিক ফয়সালার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিসমূহ (طرق الحكم القضائي): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, একজন বিচারক প্রধানত চারটি পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করেন। এগুলো হলো:

(ক) স্বীকারোক্তি (الإقرار): এটি প্রমাণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একে 'সায়্যিদুল আদিল্লাহ' বা দলিলেল সর্দার বলা হয়।

- **সংজ্ঞা:** বিবাদী (যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে) যদি বিচারকের সামনে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নেয় যে, বাদীর দাবি সত্য, তবে একে 'ইক্বরার' বা স্বীকারোক্তি বলে।

- **হুকুম:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী, **"আল-মারউ ইউআখাজু বি-ইক্বরারিহি"** (মানুষ তার স্বীকারোক্তির দ্বারা দায়বদ্ধ হয়)। বিবাদী স্বীকার করলে আর কোনো সাক্ষী বা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বিচারক তাৎক্ষণিক তার বিরুদ্ধে রায় দেবেন। তবে হুদুদ (শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি বারবার গ্রহণ করা এবং তওবার সুযোগ দেওয়া সুন্নাত।

(খ) সাক্ষী বা প্রমাণ (البينة): যদি বিবাদী অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে প্রমাণের দায়ভার বাদীর (মুদ্দাঈ) ওপর বর্তায়। হাদিসে এসেছে: **"আল-বাইয়্যিনাতু আলাল মুদ্দাঈ"** (প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব)।

- **শর্তাবলি: ১. সংখ্যা:** সাধারণত দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তবে হুদুদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে কেবল পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন এবং ক্ষেত্রবিশেষে ৪ জন সাক্ষীর প্রয়োজন (যেমন যিনার ক্ষেত্রে)। ২. **ন্যায়পরায়ণতা (আদালাত):** সাক্ষীকে অবশ্যই 'আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। ফাসিক বা কবিরা গুনাহগার ব্যক্তির সাক্ষ্য হানাফি ফিকহে গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না তার তওবা ও সততা প্রমাণিত হয়। ৩. **চাক্ষুষ জ্ঞান:** সাক্ষীকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে হবে। শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েয নেই।

(গ) শপথ বা কসম (اليمين): যদি বাদী সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয়, তবে বিচারক বিবাদীর কাছে শপথ চাইবেন। হাদিসের নীতি হলো: **"ওয়াল ইয়ামিনু আলা মান আনকারা"** (যে অস্বীকার করে, তার ওপর কসম)।

- **পদ্ধতি:** বিচারক বিবাদীকে বলবেন, "আল্লাহর নামে কসম করো যে, বাদীর দাবি সত্য নয়।"
- **ফলাফল:** যদি বিবাদী কসম খায়, তবে সে খালাস পাবে এবং মামলা খারিজ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে (নুকুল), তবে ধরে নেওয়া হবে বাদীর দাবি সত্য এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হবে।

(ঘ) নুকুল বা কসম খেতে অস্বীকার করা (النكول): বিবাদী যদি কসম খেতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে হানাফি ফিকহে একে স্বীকারোক্তির সমতুল্য বা 'বাদলুল ইক্বরার' মনে করা হয়। এর ভিত্তিতে বিচারক বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন।

৩. তদন্ত বা সাক্ষী যাচাই পদ্ধতি (كيفية التحقيق/تزكية الشهود): বিচারক কেবল সাক্ষী হাজির করলেই রায় দেবেন না; বরং সাক্ষীরা সত্যবাদী কি না, তা যাচাই করা বিচারকের ওপর ওয়াজিব। এই যাচাই প্রক্রিয়াকে **'তাযকিয়াতুশ শুহুদ'** বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এবং হানাফি ফিকহে তদন্তের পদ্ধতি দুটি স্তরে বিভক্ত:

(ক) গোপন তদন্ত (السر): বিচারক গোপনে বিশ্বস্ত লোক বা গুপ্তচর নিয়োগ করবেন সাক্ষীদের চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার জন্য।

- বিচারক একটি চিরকুটে সাক্ষীদের নাম লিখে তার নিযুক্ত তদন্তকারীর (মুজাক্কি) কাছে পাঠাবেন।
- তদন্তকারী গোপনে প্রতিবেশীদের কাছে বা সাক্ষীর পরিচিতদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, "অমুক ব্যক্তি কেমন? সে কি নামাজ পড়ে? মিথ্যা বলে কি না?"
- এই তদন্তের রিপোর্ট বিচারকের কাছে গোপনে পৌঁছাতে হবে।

(খ) প্রকাশ্য তদন্ত (العلانية): যদি গোপন তদন্তে সাক্ষীদের ভালো রিপোর্ট আসে, তবে বিচারক প্রকাশ্যে আদালতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। এ সময় তিনি

সাক্ষীদের আলাদা আলাদা করে জেরা করবেন যাতে তারা একে অপরের কথা শুনে উত্তর দিতে না পারে।

- **জেরা করার পদ্ধতি:** বিচারক ঘটনার খুঁটিনাটি (স্থান, কাল, পাত্র, পোশাকের রং ইত্যাদি) জিজ্ঞাসা করবেন। যদি সাক্ষীদের বর্ণনায় বড় ধরনের গরমিল (ইখতিলাফ) পাওয়া যায়, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দেওয়া হবে।

৪. বিচারকের নিজস্ব জ্ঞান (ইলমুল ক্বাজী): বিচারক কি তার ব্যক্তিগত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে রায় দিতে পারেন?

- **হানাফি মত:** বিচারক যদি তার বিচারিক এলাকায় সংঘটিত কোনো ঘটনা (হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত) স্বচক্ষে দেখেন বা নিশ্চিতভাবে জানেন, তবে তিনি তার সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে রায় দিতে পারেন। তবে উত্তম হলো সাক্ষী তলব করা যাতে জনগণের মনে সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। কিন্তু হুদুদ (যেমন চুরি, যিনা) বা আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে বিচারক নিজস্ব জ্ঞানে রায় দিতে পারেন না, সেখানে সাক্ষী বা স্বীকারোক্তি আবশ্যক।

৫. নথিপত্র বা লিখিত দলিলের অবস্থান: আধুনিক যুগে বা ফিকহের পরবর্তী যুগে লিখিত দলিল (যেমন রেজিস্ট্রি করা কাগজ) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। তবে হানাফি ফিকহের মূলনীতি হলো—লিখিত কাগজ জাল করা সম্ভব, তাই কেবল কাগজের ওপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া যায় না যতক্ষণ না দুইজন সাক্ষী সেই কাগজের সত্যতা নিশ্চিত করে। তবে বিচারক 'কারিনা' বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে একে ব্যবহার করতে পারেন।

৬. উপসংহার (خاتمة): হানাফি বিচার ব্যবস্থায় ফয়সালার পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচ। স্বীকারোক্তি, সাক্ষী এবং কসমের এই ধারাবাহিক প্রয়োগ নিশ্চিত করে যে, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায় এবং কোনো অপরাধী যেন পার না পায়। বিশেষ করে 'তাযকিয়াহ' বা তদন্তের ব্যবস্থা প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন অন্ধভাবে কারো কথা বিশ্বাস করে না, বরং সত্য উদঘাটনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে।

প্রশ্ন-৪৪: বিচারককে পদচ্যুত করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা কর। কোন্ কোন্ কারণে তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা ওয়াজিব হয়?
(تحدث عن حكم عزل القاضي - وما هي الأسباب التي توجب عزله عن منصبه؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): বিচারকের পদটি যেমন সম্মানের, তেমনি এটি একটি মহান আমানত। যতদিন একজন বিচারক যোগ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, ততদিন তিনি এই পদের যোগ্য। কিন্তু যখন তিনি যোগ্যতাহীন হয়ে পড়েন বা ইসলামি শরীয়তের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হন, তখন তাকে পদ থেকে অপসারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে বিচারককে পদচ্যুত বা 'আযল' (عزل) করার হুকুম, কারণ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে বিচার ব্যবস্থা কলুষমুক্ত থাকে।

২. বিচারককে পদচ্যুত করার ক্ষমতা: বিচারককে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপ্রধান বা 'ইমাম'। তাই তাকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে। তবে বিচারক নিজেও পদত্যাগ করতে পারেন। হানাফি ফিকহে পদচ্যুতির বিষয়টি দুটি অবস্থায় হতে পারে: ক. **ইনইযাল (الانعزال):** অর্থাৎ কোনো ঘোষণা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদচ্যুত হয়ে যাওয়া। খ. **আযল (العزل):** অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক আদেশের মাধ্যমে পদচ্যুত করা।

৩. পদচ্যুত বা অপসারণের কারণসমূহ (أسباب العزل): হানাফি ফিকহবিদগণ বিচারককে অপসারণের কারণগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। কিছু কারণ পাওয়া গেলে তাকে অপসারণ করা 'ওয়াজিব' হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে 'জায়েয' হয়।

(ক) যে সকল কারণে বিচারক স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদচ্যুত হন (ইনইযাল): নিচের কারণগুলো ঘটলে রাষ্ট্রপ্রধানের ঘোষণা ছাড়াই বিচারক বরখাস্ত হয়ে যান:

- **১. ধর্ম ত্যাগ (ইরতিদাদ):** বিচারক যদি (নাউজুবিল্লাহ) ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান, তবে সাথে সাথে তার বিচারক পদ বাতিল হয়ে যাবে। তার দেওয়া আগের রায়গুলো বহাল থাকবে, কিন্তু পরবর্তী কোনো রায় কার্যকর হবে না।
- **২. মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগল হওয়া:** বিচারক যদি স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে যান বা এমন মানসিক ভারসাম্য হারান যে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারেন না, তবে তিনি পদচ্যুত হবেন।

- **৩. ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ পাওয়া:** যদি বিচারক পুরোপুরি অন্ধ বা বধির (কালা) হয়ে যান, তবে তিনি আর বিচারক থাকার যোগ্য নন। কারণ অন্ধ ব্যক্তি বাদী-বিবাদীকে চিনতে পারেন না এবং বধির ব্যক্তি তাদের জবানবন্দি শুনতে পারেন না। হানাফি মতে, অন্ধ বা বধির ব্যক্তির রায় কার্যকর হয় না।

(খ) যে সকল কারণে অপসারণ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক:

- **৪. ফিসক বা পাপাচার:** বিচারক যদি প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হন, মদ্যপান করেন বা জেনেশুনে অবিচার করেন, তবে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তার বিচারকের পদে থাকাও সমীচীন নয়।

- **৫. ঘুষ গ্রহণ (রিশওয়াত):** বিচারক যদি ঘুষ গ্রহণ করেন, তবে তিনি আর বিশ্বস্ত (আমিন) থাকেন না। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে লানত দিয়েছেন। ঘুষখোর বিচারককে অবিলম্বে বরখাস্ত করা শাসকের ওপর ফরজ। 'আস-সিরাজিয়া' অনুযায়ী, ঘুষের বিনিময়ে দেওয়া রায় বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) যে সকল কারণে অপসারণ করা জায়েয (প্রশাসনিক কারণ):

- **৬. জনস্বার্থ বা মাসলাহাত:** যদি কোনো বিচারক যোগ্য হন, কিন্তু তার চেয়ে অধিক যোগ্য, জ্ঞানী ও তাকওয়াবান ব্যক্তি পাওয়া যায়, তবে অধিকতর কল্যাণের স্বার্থে বর্তমান বিচারককে সরিয়ে নতুনজনকে নিয়োগ দেওয়া জায়েয। একে 'আযলুল মাসলাহাহ' বলা হয়।

- **৭. জনগণের অসন্তোষ:** যদি এলাকার অধিকাংশ মানুষ বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে এবং তার আচরণে অসন্তুষ্ট থাকে, তবে ফিতনা রোধ করার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়া শাসকের জন্য উচিত।

৪. পদচ্যুতির হুকুম কার্যকর হওয়ার শর্ত (ইমামগণের মতভেদ): রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো বিচারককে বরখাস্ত করেন, তবে তা কখন থেকে কার্যকর হবে? এ নিয়ে হানাফি মাযহাবে একটি বিখ্যাত মতভেদ রয়েছে:

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** রাষ্ট্রপ্রধান বরখাস্তের আদেশ দিলেই বিচারক বরখাস্ত হন না; বরং বরখাস্তের খবর বিচারকের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি বিচারক পদে বহাল থাকেন।

- **যুক্তি:** যদি খবর না পৌঁছাতেই তিনি বরখাস্ত হয়ে যান, তবে মধ্যবর্তী সময়ে তিনি যেসব রায় দেবেন তা বাতিল হয়ে যাবে, এতে জনগণের ক্ষতি হবে। তাই খবর পাওয়া পর্যন্ত তার দেওয়া রায়গুলো **সহিহ ও কার্যকর** থাকবে।

- **সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মত:** রাষ্ট্রপ্রধান বরখাস্ত করার সাথে সাথেই বিচারক বরখাস্ত হয়ে যাবেন, খবর পৌঁছাক বা না পৌঁছাক।

    - **যুক্তি:** বিচারক নিয়োগ যেমন শাসকের ইচ্ছাধীন, বরখাস্তও তেমনি। এটি 'ওয়াকালাত' বা ওকালতির মতো। মুয়াক্কিল বাতিল করলেই উকিল বাতিল হয়ে যায়।

- **ফতোয়া:** হানাফি মাযহাবে ফতোয়া সাধারণত **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতের ওপর** দেওয়া হয়। অর্থাৎ, বিচারক বরখাস্তের অফিসিয়াল চিঠি বা খবর না পাওয়া পর্যন্ত তার রায় কার্যকর থাকবে।

৫. পদত্যাগ (ইস্তিকালা): বিচারক যদি নিজে মনে করেন যে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা তার দ্বারা ন্যায়বিচার হচ্ছে না, তবে তার জন্য পদত্যাগ করা জায়েয। তবে যদি তিনি একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হন এবং পদত্যাগ করলে বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তার পদত্যাগ করা হারাম।

৬. উপসংহার (خاتمة): বিচারকের পদচ্যুতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে এটি স্পষ্ট যে, শারীরিক অক্ষমতা, ঈমানের বিচ্যুতি বা নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিলে বিচারককে পদে রাখা ইসলামি আইনের পরিপন্থী। বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী অপসারণের খবর পৌঁছার শর্তটি জনভোগান্তি রোধে হানাফি ফিকহের দূরদর্শিতার প্রমাণ দেয়। শাসকের দায়িত্ব হলো সর্বদা বিচারকদের ওপর নজর রাখা এবং প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া।

الدعوى : মামলা

প্রশ্ন-৪৫: শরীয়তের পরিভাষায় 'মামলা/দাবী' (আল-দাওয়া)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফী মাযহাবে বিচারক কর্তৃক বিচার করার জন্য মামলার শুদ্ধতার শর্তাবলি কী কী?

عرف "الدعوى" شرعا - وما هي شروط صحة الدعوى لينظر فيها (القاضي في المذهب الحنفي؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হলো সঠিকভাবে মামলা দায়ের করা। কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে তার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, তবে সে বিচারকের কাছে যে অভিযোগ পেশ করে, ফিকহের পরিভাষায় তাকে 'আদ-দাওয়া' বা মামলা বলা হয়। একটি অস্পষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে বিচারক রায় দিতে পারেন না। তাই 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এবং হানাফি ফিকহের গ্রন্থগুলোতে মামলা বা দাবি শুদ্ধ হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই শর্তগুলো পূরণ হলেই কেবল বিচারক সেই মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করেন।

২. 'আল-দাওয়া'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الدعوى): 'আদ-দাওয়া' (الدعوى) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** শব্দটি 'দুআ' (دعاء) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—ডাকা, প্রার্থনা করা, দাবি করা বা নিজের দিকে কোনো কিছু সম্বন্ধ করা। আরবিতে বলা হয়: **"اِدَّعَى فُلَانٌ حَقًّا"** অর্থাৎ, "অমুক ব্যক্তি একটি অধিকার দাবি করল।"

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আস-সিরাজিয়া'র আলোকে মামলার সংজ্ঞা হলো: **" قَوْلٌ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْقَاضِي يُطَالِبُ بِهِ قَائِلُهُ حَقًّا لَهُ قِبَلَ غَيْرِهِ."** অর্থ: *"বিচারকের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন বক্তব্য, যার মাধ্যমে বক্তা (বাদী) অন্যের কাছে থাকা তার কোনো অধিকার দাবি করে।"*

অন্য সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: **"إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ."** অর্থ: *"বিচারকের সামনে অন্যের ওপর নিজের পাওনা বা অধিকার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া।"*

৩. মামলার শুদ্ধতার শর্তাবলি (شروط صحة الدعوى): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যেকোনো দাবি করলেই তা মামলা হিসেবে গণ্য হয় না। বিচারক কর্তৃক মামলাটি গৃহীত হওয়ার জন্য এবং শুনানির যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাওয়া আবশ্যক:

(ক) বিচারিক মজলিস বা আদালত (مجلس القضاء): দাবিটি অবশ্যই বিচারকের সামনে বা আদালতে পেশ করতে হবে। যদি কেউ রাস্তায় বা বাজারে দাঁড়িয়ে দাবি করে, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা 'দাওয়া' বা মামলা হিসেবে গণ্য হবে না এবং এর ওপর কোনো রায় দেওয়া যাবে না।

(খ) প্রতিপক্ষের উপস্থিতি (حضور الخصم): হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, বিবাদী (যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে) বিচারকের সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত। অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার করা বা রায় দেওয়া (ক্বাযা আলাল গায়েব) হানাফি মাযহাবে নীতিগতভাবে জায়েয নেই।

- **যুক্তি:** কারণ বিবাদী উপস্থিত না থাকলে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না, এতে তার প্রতি অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে প্রতিনিধি বা উকিলের উপস্থিতিতে বিচার হতে পারে।

(গ) দাবিটি সুনির্দিষ্ট ও জানা হওয়া (أن يكون المدعى به معلوما): বাদী কী দাবি করছে, তা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট (মা'লুম) হতে হবে। অস্পষ্ট দাবির ওপর ভিত্তি করে মামলা চলে না।

- **উদাহরণ:** কেউ বলল, "আমি এই ব্যক্তির কাছে কিছু টাকা পাই।" কিন্তু কত টাকা, তা বলল না। এই মামলা শুদ্ধ নয়। তাকে বলতে হবে, "আমি ১০০০ টাকা পাই।"
- অথবা বলল, "আমি তার কাছে একটি কাপড় পাই।" কিন্তু কাপড়ের ধরণ বা মান বলল না। এটি বাতিল। দাবিকৃত বস্তুর জাত, মান ও পরিমাণ স্পষ্ট করতে হবে।

(ঘ) দাবিকৃত বিষয়টি সম্ভবপর হওয়া (احتمال الثبوت): দাবিটি এমন হতে হবে যা বাস্তবে বা শরীয়তে সম্ভব। অসম্ভব কোনো কিছু দাবি করলে মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

- **উদাহরণ:** একজন ২০ বছরের যুবক দাবি করল যে, ২৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি তার সন্তান। এটি প্রাকৃতিকভাবে অসম্ভব। তাই এই মামলা বা দাবি শুরুতেই বাতিল (বাতিলে মাহজ) বলে গণ্য হবে।

(ঙ) দাবিটি শরীয়তসম্মত হওয়া (أن يكون المدعى حقا شرعيا): দাবিটি এমন বস্তুর ওপর হতে হবে যা শরীয়তে মূল্যবান বা বৈধ।

- **উদাহরণ:** কোনো মুসলিম যদি মদ বা শুকরের মূল্য দাবি করে মামলা করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইসলামে মদের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু কোনো অমুসলিম (জিম্মি) যদি অপর অমুসলিমের বিরুদ্ধে মদের দাম দাবি করে, তবে তাদের ধর্মে বৈধ হওয়ায় তা শোনা হতে পারে।

(চ) স্ববিরোধিতা না থাকা (عدم التناقض): বাদীর কথায় যেন স্ববিরোধিতা (তানাকুজ) না থাকে।

- **উদাহরণ:** কেউ প্রথমে বলল, "এই জমিটি আমার।" কিছুক্ষণ পর বলল, "না, এই জমিটি আমি অমুকের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি।" এই স্ববিরোধিতার কারণে তার মামলা বাতিল হয়ে যাবে।

(ছ) বাদীর আইনগত যোগ্যতা (أهلية المدعي): বাদীকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকিল) হতে হবে। পাগল বা অবুঝ শিশুর মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক (ওয়ালী) মামলা দায়ের করবেন।

৪. শর্ত লঙ্ঘনের বিধান: উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ না হলে বিচারক মামলাটি 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং বাদীকে তা সংশোধন করতে বলবেন। যদি সংশোধন না করে, তবে মামলা খারিজ (Dismiss) করে দেওয়া হবে। যেমন—অস্পষ্ট দাবি করলে বিচারক বলবেন, "তোমার দাবি স্পষ্ট করো।" স্পষ্ট না করলে শুনানি হবে না।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আল-দাওয়া' বা মামলা হলো অধিকার আদায়ের মাধ্যম। হানাফি ফিকহে মামলার শুদ্ধতার জন্য যে শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য হলো বিচার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, দ্রুত এবং বিভ্রান্তিমুক্ত রাখা। অস্পষ্ট বা অসম্ভব দাবি নিয়ে আদালতের সময় নষ্ট করা বা বিবাদীকে হয়রানি করা ইসলাম সমর্থন করে না। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'

গ্রন্থে এই শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন-৪৬: মামলা দায়ের ও শুনানির পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। বাদী (মুদ্দাঈ) এবং বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
اشرح طريقة تقديم الدعوى وسماعها - وما هو الفرق بين المدعي (والمدعى عليه؟

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আদালতের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। মামলা দায়ের থেকে শুরু করে রায় প্রদান পর্যন্ত প্রতিটি ধাপের জন্য ফিকহী নীতিমালা রয়েছে। বিচারক কিভাবে বাদীর কথা শুনবেন, কখন বিবাদীকে প্রশ্ন করবেন এবং কার ওপর প্রমাণের দায়ভার চাপাবেন—এসব কিছুই নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয়। বিশেষ করে বাদী (মুদ্দাঈ) এবং বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি)-এর পরিচয় ও পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই প্রমাণের দায়িত্ব (Burden of Proof) নির্ধারিত হয়।

২. মামলা দায়ের ও শুনানির পদ্ধতি (طريقة تقديم الدعوى وسماعها): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী বিচারিক কার্যক্রমের ধারাবাহিক ধাপগুলো নিম্নরূপ:

(ক) বিচারকের সামনে উপস্থিতি: প্রথমে বাদী ও বিবাদী উভয়ে বিচারকের (কাজী) সামনে উপস্থিত হবে এবং সম্মানের সাথে বসবে। বিচারক উভয়ের সাথে সমান আচরণ করবেন এবং কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টি দেবেন না।

(খ) দাবি পেশ করা (আরজুদ দাওয়া): বিচারক প্রথমে বাদীকে কথা বলার সুযোগ দেবেন। বাদী তার দাবি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে। বিচারক প্রয়োজন হলে তার দাবি লিখে নেবেন বা আদালতের করণিক (কাতিব) দিয়ে লেখাবেন। বাদীকে তার দাবির পরিমাণ, কারণ এবং ধরণ স্পষ্ট করতে হবে।

(গ) বিবাদীকে প্রশ্ন করা (সওয়ালুল খসম): বাদীর বক্তব্য শেষ হলে বিচারক বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করবেন, "বাদী যা দাবি করছে, তা কি সত্য?" এ সময় বিবাদীর উত্তর দুই ধরণের হতে পারে: **১. স্বীকার করা (ইক্বরার):** বিবাদী যদি বলে, "হ্যাঁ, দাবি সত্য।" তবে বিচারক সাথে সাথে বাদীর পক্ষে রায় দেবেন। ২.

অস্বীকার করা (ইনকার): বিবাদী যদি বলে, "না, এই দাবি মিথ্যা।" তখন বিচার প্রক্রিয়া পরবর্তী ধাপে যাবে।

(ঘ) প্রমাণ তলব করা (তমেবুল বাইয়্যিনাহ): বিবাদী অস্বীকার করলে বিচারক বাদীর কাছে প্রমাণ চাইবেন। তিনি বলবেন, "তোমার দাবির পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে?" ১. যদি বাদী সাক্ষী হাজির করে, তবে বিচারক তা যাচাই করে রায় দেবেন। ২. যদি বাদী সাক্ষী দিতে না পারে, তবে বিচারক বিবাদীর কাছে শপথ (কসম) চাইবেন।

(ঙ) রায় প্রদান (হুকুম): প্রমাণ বা শপথের ভিত্তিতে বিচারক চূড়ান্ত ফয়সালা দেবেন এবং তা কার্যকর করবেন।

৩. বাদী (মুদ্দাঈ) ও বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি)-এর পরিচয় ও পার্থক্য: ফিকহী পরিভাষায় বাদী ও বিবাদী কেবল "যে মামলা করে" আর "যার বিরুদ্ধে করে"—এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। হানাফি ফিকহবিদগণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দার্শনিক সংজ্ঞার মাধ্যমে এদের পার্থক্য করেছেন।

(ক) আভিধানিক অর্থ:

- **মুদ্দাঈ (المدعي):** যে ব্যক্তি দাবি করে বা আহ্বান করে।
- **মুদ্দাআ আলাইহি (المدعى عليه):** যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয় বা যাকে আহ্বান করা হয়।

(খ) পারিভাষিক সংজ্ঞার মাধ্যমে পার্থক্য:

বিষয়	বাদী (মুদ্দাঈ)	বিবাদী (মুদ্দাআ আলাইহি)
স্বাধীনতার সংজ্ঞা	"مَنْ إِذَا تَرَكَ دَعْوَاهُ تُرِكَ" অর্থ: যে ব্যক্তি যদি তার দাবি ছেড়ে দেয় বা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়, তবে তাকে জোর করা হয় না বা তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।	"مَنْ إِذَا تَرَكَ لَمْ يُتْرَكْ" অর্থ: যে ব্যক্তি চুপ থাকতে চাইলেও তাকে ছাড়া হয় না; বরং তাকে বাদীর দাবির উত্তর দিতে বাধ্য করা হয়।

জাহির বা বাহ্যিক অবস্থা	যার দাবি বাহ্যিক অবস্থার (Zahir) বিপরীত। (যেমন: কেউ বলল, "অন্যের পকেটের টাকা আমার"। এটি স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত)	যার কথা বাহ্যিক অবস্থার (Zahir) অনুকূলে। (যেমন: সে বলল, "আমার পকেটের টাকা আমারই"। এটি স্বাভাবিক অবস্থার অনুকূলে)
প্রমাণের দায়ভার	তার ওপর প্রমাণ পেশ করা আবশ্যক।হাদিস: *"প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব।"*	তার ওপর শপথ করা আবশ্যক (যদি বাদী প্রমাণ না দেয়)।হাদিস: *"শপথ করা বিবাদীর দায়িত্ব।"*
উদাহরণ	যায়েদ দাবি করল, "আমরের কাছে আমি ১০০ টাকা পাই।" এখানে যায়েদ বাদী।	আমর বলল, "আমি কোনো টাকা ধার নেইনি।" এখানে আমর বিবাদী। কারণ স্বাভাবিক অবস্থা হলো মানুষ ঋণী থাকে না।

(গ) জটিল উদাহরণের মাধ্যমে পার্থক্য: ধরা যাক, একজন ব্যক্তি (ক) বলল, "আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলাম।" তার স্ত্রী (খ) বলল, "যেহেতু তুমি মুরতাদ হয়েছ, তাই আমাদের বিয়ে ভেঙে গেছে।" এখানে কে বাদী?

- যদিও স্বামী কথাটি আগে বলেছে, কিন্তু ফিকহী দৃষ্টিতে স্ত্রী এখানে 'দাবিকারক' কারণ সে বিয়ে বিচ্ছেদ দাবি করছে। কিন্তু স্বামী যদি বলে "আমি পাগল অবস্থায় বলেছি", তখন স্বামী 'মুদ্দাঈ' হবে কারণ সে তার পাগলামি প্রমাণ করতে চাইছে যা স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত (মানুষ সাধারণত সুস্থ থাকে)।

৪. কেন এই পার্থক্য জরুরি? বিচারকের জন্য বাদী-বিবাদী নির্ণয় করা ফরজ। কারণ তিনি জানবেন কার কাছে সাক্ষী চাইবেন এবং কার কাছে কসম চাইবেন। যদি তিনি বিবাদীর কাছে সাক্ষী চান বা বাদীর কাছে কসম চান, তবে পুরো বিচার প্রক্রিয়াটি শরীয়ত বিরোধী ও বাতিল হয়ে যাবে।

৫. উপসংহার (خاتمة): মামলার শুনানি এবং বাদী-বিবাদী নির্ধারণ বিচারকার্যের মূল ভিত্তি। হানাফি ফিকহের সংজ্ঞানুযায়ী, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিবাদ সৃষ্টি করে সে বাদী, আর যাকে বাধ্য হয়ে বিবাদে জড়াতে হয় সে বিবাদী। 'আল-ফাতাওয়া

আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই পার্থক্য এবং শুনানির পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মজলুম তার অধিকার ফিরে পায় এবং বিচারক ভুল রায় দেওয়া থেকে বেঁচে থাকেন।

প্রশ্ন-৪৭: হানাফী ফিকহে মামলা প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) কী? এবং মামলাসমূহে কসমের ভূমিকা কী?

(ما هي البينة (الدليل) المعتبرة لإثبات الدعوى في الفقه الحنفي؟ وما هو دور الأيمان في الدعاوى؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কোনো দাবি কেবল মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সত্য উদঘাটনের জন্য শক্তিশালী প্রমাণের প্রয়োজন হয়। বিচারকের সামনে সত্য প্রমাণের যেসব মাধ্যম গ্রহণযোগ্য, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইয়্যিনাহ' (প্রমাণ) বা 'হুজ্জাত' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন: **"প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব এবং শপথ করা বিবাদীর দায়িত্ব।"** এই মূলনীতির আলোকেই 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' এবং হানাফি ফিকহে প্রমাণের ধরণ এবং কসমের প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. মামলা প্রমাণের গ্রহণযোগ্য মাধ্যম বা বাইয়্যিনাহ (البينة المعتبرة): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিচারিক রায় প্রদানের জন্য প্রধানত তিন ধরণের প্রমাণ বা বাইয়্যিনাহ গ্রহণ করা হয়:

(ক) সাক্ষ্যদান (হুকুমুশ শাহাদাহ): মামলা প্রমাণের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রধান মাধ্যম হলো সাক্ষী। বাদীর দাবি প্রমাণের জন্য সাক্ষীর বিকল্প নেই।

- **সাক্ষীর সংখ্যা ও যোগ্যতা: ১. হুদুদ ও কিসাস ব্যতীত অন্যান্য মামলায় (সম্পদ, বিবাহ):** দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন: *"তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী রাখো..."* (সূরা বাকারা: ২৮২)। ২. **হুদুদ (শাস্তি) মামলায়:**
  - যিনার ক্ষেত্রে: চারজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক।
  - অন্যান্য হুদুদ (চুরি, মদ্যপান): দুইজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক। (নারীদের সাক্ষ্য হুদুদে গ্রহণযোগ্য নয়)।

- **সাক্ষীর গুণাবলি:** সাক্ষীকে অবশ্যই মুসলিম, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী এবং 'আদিল' বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। মিথ্যাবাদী বা ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) লিখিত দলিল (আল-কিতাবাহ): ক্লাসিক্যাল হানাফি ফিকহে লিখিত দলিল বা কাগজ (Deed/Document) এককভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতো না, কারণ কাগজ জাল করা সম্ভব।

- **বর্তমান বিধান:** তবে পরবর্তী ফকীহগণ এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যদি লিখিত দলিলটি বিচারকের কাছে নির্ভরযোগ্য মনে হয় এবং তা সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করা হয় বা দুইজন সাক্ষী সেই দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করে, তবে তা 'বাইয়্যিনাহ' বা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে। একে 'কারিনা' বা আলামত হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

(গ) বিচারকের নিজস্ব জ্ঞান (ইলমুল ক্বাজী): হানাফি মাযহাব মতে, হুদুদ বা আল্লাহর হক ব্যতীত বান্দার হকের ক্ষেত্রে বিচারক যদি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হন, তবে তিনি সাক্ষী ছাড়াই তার নিজস্ব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে রায় দিতে পারেন। তবে এটি ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কায় বর্তমানে নিরুৎসাহিত করা হয়।

৩. মামলাসমূহে কসম বা শপথের ভূমিকা (دور الأيمان في الدعاوى): যখন বাদী তার দাবির পক্ষে সাক্ষী বা প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হয়, তখনই 'কসম' বা শপথের ভূমিকা শুরু হয়। কসম মূলত বিবাদীর হাতিয়ার। এর প্রয়োগ ও বিধান নিম্নরূপ:

(ক) কসমের স্থান: হাদিস অনুযায়ী— **"واليمين على من أنكر"** (যে অস্বীকার করে, তার ওপর কসম)। অর্থাৎ, কসম কেবল বিবাদীর (মুদ্দাআ আলাইহি) ওপর বর্তায়। বাদীর ওপর কখনো কসম দেওয়া হয় না (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন— লিআন)।

(খ) কসমের পদ্ধতি: বিচারক বিবাদীকে বলবেন: "তুমি আল্লাহর নামে কসম করো যে, বাদীর দাবি সত্য নয়।"

- কসম কেবল 'আল্লাহ'র নামে হতে হবে। অন্য কোনো কিছুর নামে কসম আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ) কসমের ফলাফল: কসম চাওয়ার পর দুইটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে:

- **১. বিবাদী কসম খেলে (ইকদামে ইয়ামিন):** যদি বিবাদী আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে যে সে নির্দোষ বা ঋণী নয়, তবে বিচারক তাকে খালাস দিয়ে দেবেন এবং মামলা খারিজ করে দেবেন। কারণ রাসুল (সা.) বলেছেন, *"যে আল্লাহর নামে কসম করে, তাকে সত্যবাদী মনে করো।"* পরকালে সে মিথ্যার শাস্তি পাবে, কিন্তু দুনিয়ায় সে মুক্ত।

- **২. বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করলে (নুকুল আনিল ইয়ামিন):** যদি বিবাদী কসম খেতে রাজি না হয় বা চুপ থাকে, তবে হানাফি ফিকহে একে 'স্বীকারোক্তি' বা 'বাদলুল ইক্বরার' হিসেবে গণ্য করা হয়।
  - **হুকুম:** এমতাবস্থায় বিচারক ধরে নেবেন যে বিবাদী মিথ্যা বলছে (তাই সে আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেতে ভয় পাচ্ছে) এবং বাদীর দাবি সত্য। ফলে বিচারক বিবাদীর বিরুদ্ধে এবং বাদীর পক্ষে রায় দেবেন।

(ঘ) কসম ফিরিয়ে দেওয়া (রদ্দে ইয়ামিন): শাফেয়ী মাযহাবে বিবাদী কসম না খেয়ে বাদীর দিকে কসম ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু **হানাফি মাযহাবে 'রদ্দে ইয়ামিন' বা বাদীর ওপর কসম ফেরত দেওয়ার কোনো বিধান নেই।** হানাফি মতে, কসম কেবল বিবাদীর জন্যই খাস।

৪. বিশেষ ক্ষেত্রে কসম:

- **লিআন:** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যিনার অপবাদের ক্ষেত্রে উভয়কে কসম করতে হয়। এটি সাধারণ কসম নয়, বরং এটি বিশেষ সাক্ষ্য।

- **কাসামাহ:** অজ্ঞাত হত্যার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর ৫০ জন লোক কসম খেলে দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হয়।

৫. উপসংহার (خاتمة): মামলা প্রমাণে 'বাইয়্যিনাহ' বা সাক্ষী হলো আলোর মতো, যা সত্যকে উদ্ভাসিত করে। আর 'কসম' হলো ঢালের মতো, যা মিথ্যা অভিযোগ থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্ষা করে। হানাফি ফিকহে এই দুটির অবস্থান অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র মতে, বিচারক কখনোই প্রমাণ ছাড়া অনুমান করে বা কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে রায় দেবেন না। বাদীর অক্ষমতার পরেই কেবল কসমের স্তর আসে, যা বিচার ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে।

الإقرار والوكالة : স্বীকারোক্তি ও ওকালতি

প্রশ্ন-৪৮: শরীয়তের পরিভাষায় 'স্বীকারোক্তি' (আল-ইক্বার)-এর সংজ্ঞা দাও। স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি কী কী, যাতে এর উপর ভিত্তি করে ফয়সালা দেওয়া যায়?

عرف "الإقرار" شرعا - وما هي شروط صحة الإقرار حتى يترتب عليه (الحكم؟

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সত্য উদঘাটন এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে 'স্বীকারোক্তি' বা 'আল-ইক্বার' হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ও চূড়ান্ত দলিল। বিচারকের কাছে সাক্ষী বা প্রমাণের চেয়েও আসামীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য। ফিকহী পরিভাষায় একে 'সায়্যিদুল আদিল্লাহ' বা 'দলিলসমূহের সর্দার' বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে স্বীকারোক্তির সংজ্ঞা, গুরুত্ব এবং এটি কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত, কোনো ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় নিজের বিরুদ্ধে কোনো দায় স্বীকার করে নেয়, তখন বিচারকের জন্য রায় দেওয়া সহজ হয়ে যায়।

২. 'আল-ইক্বার'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الإقرار): 'ইক্বার' (الإقرار) শব্দটি আরবি 'কারার' (قرار) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** এর আভিধানিক অর্থ হলো—কোনো কিছুকে সাব্যস্ত করা, স্বীকার করা, স্থির করা বা ঘোষণা দেওয়া। আরবিতে বলা হয়: **"أَقَرَّ بِالحَقِّ"** অর্থাৎ, "সে সত্যটি স্বীকার করে নিল।" এটি 'ইনকার' বা অস্বীকারের বিপরীত।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আস-সিরাজিয়া'র আলোকে স্বীকারোক্তির সংজ্ঞা হলো: **"هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ."** অর্থ: *"নিজের ওপর অন্যের কোনো অধিকার বা পাওনা সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া বা স্বীকারোক্তি প্রদান করা।"*

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. ইখবার (সংবাদ): এটি এমন একটি সংবাদ যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, কিন্তু স্বীকারকারী নিজের বিরুদ্ধে বলার কারণে তা সত্য বলে

গণ্য হয়। ২. **হাক্কুল গায়ের (অন্যের অধিকার):** স্বীকারোক্তি হতে হবে অন্যের অধিকারের ব্যাপারে। নিজের অধিকার দাবি করাকে 'দাওয়া' বা মামলা বলে, ইক্বার নয়। ৩. **আলা নাফসিহি (নিজের বিরুদ্ধে):** স্বীকারোক্তি অবশ্যই নিজের বিপক্ষে হতে হবে। যদি কেউ অন্যের বিপক্ষে বলে, তবে তা 'শাহাদাত' বা সাক্ষ্য হবে।

৩. স্বীকারোক্তির রুকনসমূহ (أركان الإقرار): একটি পূর্ণাঙ্গ স্বীকারোক্তির চারটি স্তম্ভ রয়েছে: ১. **মুক্বির (المقر):** যিনি স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন (স্বীকারকারী)। ২. **মুক্বার লাহু (المقر له):** যার অনুকূলে বা যার পাওনা স্বীকার করা হচ্ছে (পাওনাদার)। ৩. **মুক্বার বিহি (المقر به):** যে বিষয়টি স্বীকার করা হচ্ছে (যেমন—টাকা, সম্পদ)। ৪. **সিগাহ (الصيغة):** স্বীকারোক্তির ভাষা বা শব্দাবলী।

৪. স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الإقرار): যেকোনো স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে বিচারক রায় দিতে পারেন না। স্বীকারোক্তিটি শরয়ী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য হানাফি ফিকহে 'মুক্বির' বা স্বীকারকারীর মধ্যে এবং স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত থাকা আবশ্যক। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

(ক) স্বীকারকারীর (মুক্বির) যোগ্যতা বা শর্তাবলি:

- **১. আকল (সুস্থ মস্তিষ্ক):** স্বীকারকারীকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগল (মাজনুন) বা মস্তিষ্কবিকৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি বাতিল। কারণ তাদের কথার কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

- **২. বুলুগ (প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া):** স্বীকারকারীকে বালেগ হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালক শিশু যদি নিজের বিরুদ্ধে কোনো ঋণের স্বীকারোক্তি দেয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অনুমতিপ্রাপ্ত দাস বা ব্যবসায়িক অনুমতিপ্রাপ্ত কিশোরের স্বীকারোক্তি শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।

- **৩. ইখতিয়ার (স্বেচ্ছায় দেওয়া):** স্বীকারোক্তি অবশ্যই স্বেচ্ছায় হতে হবে। যদি কাউকে জোর করে, মারধর করে বা ভয় দেখিয়ে (ইকরাহ) স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়, তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী সেই স্বীকারোক্তি **সম্পূর্ণ বাতিল**। রাষ্ট্রীয় চাপে বা রিমান্ডে নেওয়া জোরপূর্বক জবানবন্দির কোনো শরয়ী মূল্য নেই।

- **৪. হুররিয়াত (স্বাধীন হওয়া):** হুদুদ বা কিসাসের ক্ষেত্রে দাস-দাসীর স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হলেও, আর্থিক বিষয়ে দাসের স্বীকারোক্তি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া কার্যকর হয় না।

(খ) পাওনাদারের (মুক্বার লাহু) শর্তাবলি:

- **১. অস্তিত্ব থাকা:** যার অনুকূলে স্বীকার করা হচ্ছে, স্বীকারোক্তির সময় তার অস্তিত্ব থাকতে হবে (বাস্তবে বা হুকুমগতভাবে)। যেমন—কেউ বলল, "আমি এই মৃত ব্যক্তির কাছে ঋণী ছিলাম," এটি শুদ্ধ। কিন্তু কেউ যদি এমন কারো নামে স্বীকার করে যার অস্তিত্বই নেই, তবে তা বাতিল।

- **২. পরিচিতি:** পাওনাদার নির্দিষ্ট ও পরিচিত হতে হবে। কেউ যদি বলে, "আমি মানুষের কাছে ঋণী," কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম না বলে, তবে এই স্বীকারোক্তি অস্পষ্টতার কারণে কার্যকর হবে না।

(গ) স্বীকারকৃত বস্তুর (মুক্বার বিহি) শর্তাবলি:

- **১. মাল বা অধিকার হওয়া:** স্বীকারকৃত বস্তুটি শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্যবান সম্পদ বা অধিকার হতে হবে।

- **২. নিজের দখলে থাকা:** স্বীকারকারী এমন বস্তুর ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেবে যা তার হাতে বা জিম্মায় আছে। অন্যের হাতের মালের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিলে তা সাক্ষ্য হবে, ইক্বার নয়।

- **৩. মিথ্যা প্রমাণিত না হওয়া:** স্বীকারোক্তিটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে বা বিচারকের নিশ্চিত জ্ঞানে মিথ্যা হওয়া যাবে না। যেমন—একজন কম বয়সী যুবক দাবি করল যে, তার চেয়ে বয়স্ক একজন ব্যক্তি তার সন্তান। এটি প্রাকৃতিকভাবে অসম্ভব এবং মিথ্যা। এমন স্বীকারোক্তি বাতিল।

৫. স্বীকারোক্তির প্রভাব (أثر الإقرار): যখন শর্তগুলো পূরণ করে কেউ স্বীকারোক্তি দেয়, তখন তার প্রভাব নিম্নরূপ:

- **বাধ্যবাধকতা:** স্বীকারকারী তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। যদি সে টাকার কথা স্বীকার করে, তবে টাকা দিতে হবে। যদি অপরাধ স্বীকার করে, তবে শাস্তি পেতে হবে।

- **প্রমাণের প্রয়োজন নেই:** স্বীকারোক্তির পর বাদীর আর কোনো সাক্ষী বা প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। হাদিসে এসেছে: **"তোমার স্বীকারোক্তিই তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ।"**

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'আল-ইক্বার' বা স্বীকারোক্তি হলো বিবেকের দংশন থেকে সত্যের পথে ফিরে আসার নাম। এটি বিচারকের কাজকে সহজ করে দেয় এবং আদালতের সময় বাঁচায়। তবে হানাফি ফিকহে এর শর্তগুলো—বিশেষ করে 'স্বেচ্ছায় দেওয়া'র শর্তটি—প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইনে জোরজবরদস্তির কোনো স্থান নেই। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই শর্তগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বিচারকদের জন্য এক অনন্য নির্দেশিকা।

প্রশ্ন-৪৯: আল্লাহর হক্ক এবং বান্দার হক্ক (অধিকার) সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির হুকুম কী? স্বীকারকারী কি তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসতে পারে?

(ما هو حكم الإقرار بحقوق الله وحقوق العباد؟ وهل يرجع المقر عن إقراره؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): স্বীকারোক্তি বা ইক্বার বিচারিক ফয়সালার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তবে সব স্বীকারোক্তির হুকুম বা প্রকৃতি এক নয়। ইসলামি শরীয়তে অধিকার বা 'হক' প্রধানত দুই প্রকার: 'হাক্কুল্লাহ' (আল্লাহর অধিকার) এবং 'হাক্কুল ইবাদ' (বান্দার অধিকার)। এই দুই ধরনের অধিকারের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির পদ্ধতি, কার্যকর হওয়ার শর্ত এবং স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসা বা 'রুজু' করার বিধানে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে এই পার্থক্যগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা অপরাধ ও দেওয়ানি আইনের ভিত্তি।

২. অধিকারের প্রকারভেদ ও স্বীকারোক্তির হুকুম (أنواع الحقوق وحكم الإقرار):

(ক) হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার: আল্লাহর অধিকার বলতে মূলত সেই সব বিধানকে বোঝায় যা জনস্বার্থে বা ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষায় পালন করা হয় এবং যার লঙ্ঘন করলে নির্দিষ্ট শাস্তি (হদ) নির্ধারিত আছে। যেমন—যিনা (ব্যভিচার), মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি।

- **স্বীকারোক্তির ভিত্তি:** আল্লাহর হকের ভিত্তি হলো 'সতর' বা গোপন রাখা এবং 'তাজাওয়ুজ' বা ক্ষমা করা। তাই এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকে খুব উৎসাহিত করা হয় না।

- **স্বীকারোক্তির পদ্ধতি:** যিনার ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবে এক বৈঠকে বা ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে **চারবার** স্বীকারোক্তি দেওয়া আবশ্যক। চুরির বা মদ্যপানের ক্ষেত্রে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট, তবে বিচারক তাকে বারবার ভেবে দেখার সুযোগ দেবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মাঈজ (রা.)-কে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তিনি স্বীকারোক্তি থেকে সরে আসেন।

(খ) হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার: বান্দার অধিকার বলতে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন, ঋণ, গচ্ছিত সম্পদ, কিসাস (প্রতিশোধ) বা অপবাদের শাস্তি (হদ্দুল কাজফ) বোঝায়।

- **স্বীকারোক্তির ভিত্তি:** বান্দার হকের ভিত্তি হলো **'মুশাহহাহ'** বা কড়াকড়ি এবং অধিকার নিশ্চিত করা। এখানে গোপনীয়তার সুযোগ নেই।

- **স্বীকারোক্তির পদ্ধতি:** বান্দার হকের ক্ষেত্রে (যেমন—আমি অমুকের কাছে ঋণী) একবার স্বীকারোক্তি দিলেই তা চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায়। এখানে বারবার স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসা বা রুজু করার বিধান (حكم الرجوع عن الإقرار): স্বীকারকারী যদি স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর আবার তা অস্বীকার করে বা বলে "আমি মিথ্যা বলেছি", তবে তার এই ফিরে আসা বা 'রুজু' গ্রহণযোগ্য হবে কি না—তা নির্ভর করে অধিকারের প্রকারভেদের ওপর।

(ক) হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে রুজু: হানাফি ফিকহের মূলনীতি হলো—**"আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে (হুদুদ) স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসা বা রুজু করা বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য।"**

- **কারণ:** হুদুদ বা শাস্তি সন্দেহের (শুবহা) কারণে রহিত হয়ে যায়। যখন ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর তা অস্বীকার করে বা পালিয়ে যায়, তখন তার আগের কথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আর ইসলামি আইনে "সন্দেহের কারণে শাস্তি মাফ করা হয়"।

- **উদাহরণঃ** কেউ স্বীকার করল যে সে যিনা করেছে বা মদ পান করেছে। বিচারক শাস্তির রায় দেওয়ার আগে বা শাস্তি কার্যকর করার সময় যদি সে বলে, "না, আমি করিনি" অথবা সে দৌড়ে পালিয়ে যায়, তবে তাকে আর শাস্তি দেওয়া হবে না এবং তার রুজু গ্রহণ করা হবে।

- **ব্যতিক্রমঃ** হানাফি মতে, চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি (আল্লাহর হক) রুজু করলে মাফ হয়ে যায়, কিন্তু চোরাই মাল ফেরত দেওয়া (বান্দার হক) মাফ হয় না।

(খ) হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হকের ক্ষেত্রে রুজুঃ হানাফি ফিকহের সুস্পষ্ট ফতোয়া হলো— **"বান্দার হকের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসা বা রুজু করা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।"**

- **কারণঃ** বান্দার হক বাতিল করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেউ যদি একবার স্বীকার করে যে সে ঋণী, তবে সে নিজেকে দায়বদ্ধ করে ফেলল। এরপর "আমি মিথ্যা বলেছি" বা "ঠাট্টা করেছি" বললে তা গ্রহণ করা হবে না। কারণ এতে মানুষের সম্পদ ও অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ তৈরি হবে।

- **উদাহরণঃ** যায়েদ স্বীকার করল, "আমি বকরের কাছে ১০০০ টাকা পাই।" এরপর সে বলল, "না, আমি ভুল বলেছি, আমি পাই না।" বিচারক তার দ্বিতীয় কথা মানবেন না এবং তাকে টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য করবেন।

- **কিসাস ও হদ্দুল কাজফঃ** কিসাস (হত্যার বদলা) এবং অপবাদের শাস্তি (হদ্দুল কাজফ) যদিও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এগুলো 'বান্দার হক' হিসেবে গণ্য। তাই হত্যার স্বীকারোক্তি বা অপবাদের স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর তা থেকে ফিরে আসা যায় না এবং শাস্তি বহাল থাকে।

৪. মিশ্র অধিকারের ক্ষেত্রে বিধানঃ কিছু অপরাধ আছে যেখানে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক জড়িত। যেমন—চুরি (Sariqah)।

- চুরিতে হাত কাটা = আল্লাহর হক।
- চোরাই মাল ফেরত দেওয়া = বান্দার হক।

- **বিধান:** চোর যদি স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে, তবে হানাফি মতে তার **হাত কাটা যাবে না** (শাস্তি মাফ), কিন্তু তাকে **চোরাই মালের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে** (সম্পদ মাফ হবে না)। কারণ রুজু কেবল আল্লাহর হকে খাটে, বান্দার হকে নয়।

৫. দলিলের আলোকপাত:

- রাসুলুল্লাহ (সা.) এক চোরের হাত কাটার আদেশ দিয়েছিলেন। যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে বলল "আমি চুরি করিনি"। তখন রাসুল (সা.) বললেন, *"তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? হয়তো সে তওবা করত।"* এটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর হকে রুজু গ্রহণযোগ্য।

- অন্যদিকে, ঋণ বা লেনদেনের ক্ষেত্রে রাসুল (সা.) বলেছেন, *"স্বীকারোক্তি স্বীকারকারীর ওপর দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে।"* এখানে ফিরে আসার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি।

৬. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, ইসলামি ফিকহে স্বীকারোক্তি ও তা থেকে ফিরে আসার বিধানটি ন্যায়বিচার ও করুণার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে শরীয়ত মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে শাস্তির পথ বন্ধ করতে চায়, তাই রুজু বা অস্বীকারকে গ্রহণ করে। কিন্তু বান্দার হকের ক্ষেত্রে শরীয়ত কঠোর অবস্থান নেয় যাতে কেউ অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে না পারে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই তুলে ধরা হয়েছে, যা বিচারককে সঠিক রায় প্রদানে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৫০: ফিকহে 'ওকালতি/প্রতিনিধিত্ব' (আল-ওয়াকালা)-এর সংজ্ঞা দাও। হানাফীদের মতে ওকালতি শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক রুকনগুলো কী কী?
عرف "الوكالة" في الفقه - وما هي الأركان الأساسية لصحة عقد الوكالة (عند الحنفية؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): মানুষ সামাজিক জীব এবং তার জীবনের প্রয়োজনে তাকে প্রতিনিয়ত অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। একজন মানুষের পক্ষে সব কাজ একা সম্পাদন করা বা সব জায়গায় সশরীরে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় না। তাই ইসলামি শরীয়ত মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নিজের কাজ অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নেওয়া বা প্রতিনিধিত্বের বিধান বৈধ করেছে। একে ফিকহের পরিভাষায় 'আল-

ওয়াকালা' বা ওকালতি বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ওকালতির সংজ্ঞা, রুকন এবং শর্তাবলি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এটি একটি বৈধ চুক্তি যা পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. 'আল-ওয়াকালা'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الوكالة): 'ওয়াকালা' (الوكالة) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** শব্দটি 'ওয়াকল' (وكل) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে: **১. হেফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ (الحفظ):** যেমন আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বলা হয়— 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল' (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী)। ২. **অর্পণ করা বা ন্যস্ত করা (التفويض):** যেমন বলা হয়, আমি আমার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করলাম (তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ)। ৩. **আস্থা স্থাপন করা (الاعتماد):** অন্যের ওপর ভরসা করা।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে ওকালতির সংজ্ঞা হলো: **" هُوَ إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ."** অর্থ: *"কোনো জায়েয এবং সুনির্দিষ্ট কাজে অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি বানানোকে ওকালতি বলে।"*

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. স্থলাভিষিক্ত করা: উকিল মুয়াক্কিলের (মূল ব্যক্তির) পক্ষ থেকে কাজ করে, নিজের জন্য নয়। ২. **জায়েয কাজ:** কাজটি শরীয়তে বৈধ হতে হবে। হারাম কাজ (যেমন মদ কেনা বা কাউকে হত্যা করা)-এর ওকালতি জায়েয নেই। ৩. **সুনির্দিষ্ট:** কাজটি জানা থাকতে হবে, যাতে উকিল তা পালন করতে পারে।

৩. ওকালতি শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক রুকনসমূহ (أركان الوكالة): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, ওকালতির চুক্তি বা 'আকদ' শুদ্ধ হওয়ার জন্য চারটি মৌলিক রুকন বা স্তম্ভ পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। এগুলোর কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ক) মুয়াক্কিল (الموكل): যিনি অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন বা নিজের ক্ষমতা অর্পণ করেন।

- **শর্ত:** মুয়াক্কিলকে অবশ্যই চুক্তি করার যোগ্যতাসম্পন্ন (আহলুল আকদ) হতে হবে। অর্থাৎ তাকে **সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকিল)** এবং **প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ)** হতে হবে।

- পাগল বা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু (যে ভালো-মন্দ বোঝে না) কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পারে না। তবে 'মুমায়yiz' বা বুদ্ধিমান শিশু যদি নিজের এমন কোনো ব্যাপারে উকিল নিয়োগ করে যা তার জন্য উপকারী (যেমন দান গ্রহণ করা), তবে তা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েয হতে পারে।

(খ) উকিল (الوكيل): যাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় বা দায়িত্ব দেওয়া হয়।

- **শর্ত:** উকিলকে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করার মতো বিবেকবান বা **সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী** হতে হবে। পাগল বা একেবারে ছোট শিশুকে উকিল নিয়োগ করা যাবে না।

- উকিল হওয়ার জন্য স্বাধীন বা পূর্ণ বয়স্ক হওয়া হানাফি মতে শর্ত নয়। একজন বুদ্ধিমান দাস বা বুদ্ধিমান কিশোরকেও উকিল বানানো জায়েয, যদি সে ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন বোঝে।

(গ) মুয়াক্কাল বিহি (الموكل به): যে কাজের জন্য ওকালতি করা হচ্ছে বা বিষয়বস্তু।

- **শর্ত ১: প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা:** কাজটি এমন হতে হবে যাতে প্রতিনিধিত্ব চলে। যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদি, তালাক, বা ঋণ আদায়। কিন্তু ইবাদত (যেমন—নামায, রোজা) বা কসমের ক্ষেত্রে ওকালতি চলে না। কেউ অন্যের হয়ে নামায পড়তে পারে না।

- **শর্ত ২: মালিকানা ও ক্ষমতা:** মুয়াক্কিল যে কাজের দায়িত্ব দিচ্ছে, সেই কাজের ক্ষমতা তার নিজের থাকতে হবে। যার নিজের কোনো জিনিসের মালিকানা নেই, সে তা বিক্রি করার জন্য অন্যকে উকিল বানাতে পারে না।

- **শর্ত ৩: সুনির্দিষ্ট হওয়া:** কাজটি উকিলের কাছে স্পষ্ট হতে হবে। যেমন—"আমার জন্য একটি গরু কেন।" যদি বলা হয়, "আমার জন্য কিছু কেন" কিন্তু কী কিনবে তা বলা না হয়, তবে এই ওকালতি 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ।

(ঘ) সিগাহ (الصيغة): প্রস্তাব (ইজাব) এবং গ্রহণ (কবুল)।

- মুয়াক্কিল বলবে: "আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে এই বাড়িটি বিক্রি করার উকিল নিয়োগ করলাম।"
- উকিল বলবে: "আমি গ্রহণ করলাম" অথবা সে কাজ শুরু করে দেবে। মৌখিক কবুল জরুরি নয়, কাজ শুরু করলেই কবুল বোঝানো হয়।

৪. ওকালতির প্রকারভেদ (أنواع الوكالة): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও ফিকহের দৃষ্টিতে ওকালতি দুই প্রকার: **১. ওয়াকালাহ আম্মাহ (সাধারণ ওকালতি):** যখন মুয়াক্কিল উকিলকে সব ধরণের কাজ করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়। যেমন—"আমার সব সম্পত্তি দেখাশোনা ও বিক্রির দায়িত্ব তোমাকে দিলাম।" **২. ওয়াকালাহ খাসসাহ (বিশেষ ওকালতি):** যখন নির্দিষ্ট কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন—"শুধু আমার এই গাড়িটি বিক্রি করো।"

৫. দলিল বা প্রমাণ (الأدلة):

- **আল-কুরআন:** আসহাবে কাহাফের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে: *"তোমরা তোমাদের একজনকে এই মুদ্রাসহ শহরে পাঠাও..."* (সূরা কাহাফ: ১৯)। এটি ওকালতির বৈধতার দলিল।
- **আল-হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের বিভিন্ন কাজে (যেমন—যাকাত আদায়, পশু ক্রয়) উকিল হিসেবে নিয়োগ দিতেন। হাকিম ইবনে হিজাম (রা.)-কে তিনি কুরবানীর পশু কেনার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, ওকালতি ইসলামি অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটি মানুষের সীমাবদ্ধতা দূর করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দুয়ার খুলে দেয়। হানাফি ফিকহে ওকালতির রুকনগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে মুয়াক্কিল ও উকিল—উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে এবং ভবিষ্যতে কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয়। মুয়াক্কিলের যোগ্যতা, উকিলের বুদ্ধিমত্তা এবং কাজের স্পষ্টতা—এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ই হলো একটি শুদ্ধ ওকালতি চুক্তির ভিত্তি।

প্রশ্ন-৫১: মুয়াক্কিল (যার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা হলো)-এর অধিকারের ক্ষেত্রে উকিলের আচরণের বিধান ব্যাখ্যা কর। উকিলের হাতে যা নষ্ট হয়, তার জন্য কি তিনি দায়ী থাকবেন?

اشرح أحكام تصرف الوكيل في حقوق الموكل - وهل يضمن الوكيل ما يتلف في يده؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ওকালতি বা প্রতিনিধিত্ব কেবল একটি চুক্তি নয়, বরং এটি একটি পবিত্র আমানত। মুয়াক্কিল (Principal) উকিলের ওপর আস্থা রেখে তাকে কোনো দায়িত্ব দেন। তাই উকিলের প্রতিটি আচরণ বা 'তাসাররুফ' মুয়াক্কিলের স্বার্থের অনুকূলে হওয়া আবশ্যক। হানাফি ফিকহে উকিলের আচরণের সীমা এবং তার দায়বদ্ধতা (Liability) নিয়ে বিস্তারিত নীতিমালা রয়েছে। বিশেষ করে উকিলের হাতে সম্পদ নষ্ট হলে তিনি ক্ষতিপূরণ দেবেন কি না—এটি 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা।

২. মুয়াক্কিলের অধিকার রক্ষায় উকিলের আচরণবিধি (أحكام تصرف الوكيل): উকিল স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না; তাকে মুয়াক্কিলের নির্দেশ ও শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়। উকিলের আচরণের প্রধান বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) মুয়াক্কিলের নির্দেশের আনুগত্য: উকিলকে মুয়াক্কিলের শর্ত ও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

- **উদাহরণ:** মুয়াক্কিল যদি বলে, "আমার গাড়িটি ১ লক্ষ টাকায় বিক্রি করো", তবে উকিল তা ৯০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবে না। করলে চুক্তিটি মুয়াক্কিলের অনুমতির ওপর ঝুলে থাকবে (মাওকুফ)।

(খ) মুয়াক্কিলের স্বার্থরক্ষা (খায়েরখাওয়া): যদিও মুয়াক্কিল কোনো দাম নির্দিষ্ট না করে দেয়, তবুও উকিলকে বাজারের প্রচলিত মূল্যে (সিমতুল মিসল) কেনাবেচা করতে হবে।

- **গবন ফাহিশ (অতিরিক্ত ঠকা):** উকিল যদি বাজারের দামের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করে বা অনেক বেশি দামে কেনে (যা মানুষ মেনে নেয় না), তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় মুয়াক্কিলের ওপর বর্তাবে না। উকিলকে এর দায় নিতে হবে।

(গ) নিজের সাথে লেনদেন নিষিদ্ধ: হানাফি মাযহাবের মূলনীতি হলো— **"উকিল নিজের কেনা-বেচার দায়িত্বপ্রাপ্ত বস্তুর ক্রেতা বা বিক্রেতা হতে পারে না।"**

- অর্থাৎ, যাকে বাড়ি বিক্রি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে নিজেই সেই বাড়ি কিনতে পারবে না। কারণ এক ব্যক্তি একই সাথে ক্রেতা ও বিক্রেতা (শিকার ও শিকারী) হতে পারে না। এতে স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) হয় এবং মুয়াক্কিলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) বাকিতে বিক্রির বিধান: যদি মুয়াক্কিল নগদ বিক্রির নির্দেশ দেয়, তবে উকিল বাকিতে বিক্রি করতে পারবে না। আর যদি কিছু না বলে (নিঃশর্ত থাকে), তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে উকিল প্রথা অনুযায়ী বাকিতে বিক্রি করতে পারবে, তবে তা যুক্তিসঙ্গত মেয়াদে হতে হবে।

৩. উকিলের হাতে সম্পদ নষ্ট হলে তার দায়বদ্ধতা বা যামান (هل يضمن الوكيل؟):
ফিকহী পরিভাষায় উকিলের হাতকে **'ইয়াদুল আমানাহ'** বা আমানতদারের হাত বলা হয়, 'ইয়াদুল যামান' বা ক্ষতিপূরণদাতার হাত নয়। এর হুকুম ও বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

(ক) সাধারণ অবস্থা (ক্ষতিপূরণ নেই): হানাফি ফিকহের সর্বসম্মত মত হলো— উকিলের হাতে যদি মুয়াক্কিলের মাল (টাকা বা পণ্য) কোনো অবহেলা ছাড়াই নষ্ট হয়ে যায়, তবে উকিলকে **কোনো ক্ষতিপূরণ (যামান) দিতে হবে না**।

- **উদাহরণ:** উকিল মুয়াক্কিলের জন্য গরু কিনে আনছিল। পথে ডাকাতরা গরু ছিনিয়ে নিল অথবা গরুটি অসুস্থ হয়ে মারা গেল। এক্ষেত্রে উকিল দায়ী নয় এবং তাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। গরুর লোকসান মুয়াক্কিলকে বহন করতে হবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যে আমানত রাখে তার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।"* উকিল কেবল একজন সাহায্যকারী, সে লাভের অংশীদার নয়, তাই লোকসানেরও ভাগীদার নয়।

(খ) ব্যতিক্রমী অবস্থা (যখন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়): তবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে উকিলকে সম্পদের পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হয়। একে **'তাআদ্দি'** বা সীমালঙ্ঘন বলা হয়। ক্ষেত্রগুলো হলো:

- **১. মুখালাফাত বা নির্দেশ অমান্য করা:** যদি মুয়াক্কিল বলে, "গরুটি কিনে নৌপথে আনবে না", কিন্তু উকিল নৌপথে আনল এবং নৌকা ডুবে গরু মারা গেল। এখানে উকিল স্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে, তাই তাকে গরুর দাম দিতে হবে।

- **২. অবহেলা বা ত্রুটি (তাকসির):** উকিল যদি মালটি অরক্ষিত স্থানে ফেলে রাখে বা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে নষ্ট করে। যেমন— মুয়াক্কিলের টাকায় কেনা গাড়ি নিজের ব্যক্তিগত ভ্রমণে ব্যবহার করল এবং এক্সিডেন্ট করল। এখানে সে 'গাসিব' (দখলদার) হিসেবে গণ্য হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

- **৩. নিজের মাল বলে দাবি করা:** যদি উকিল মুয়াক্কিলের মালকে নিজের মাল বলে দাবি করে এবং পরে তা নষ্ট হয়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(গ) উকিলের কথার গ্রহণযোগ্যতা: যদি মাল নষ্ট হওয়ার পর উকিল দাবি করে যে, "এটি অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট হয়েছে", আর মুয়াক্কিল বলে "তুমি অবহেলা করেছ"— তবে কার কথা মানা হবে?

- **হুকুম:** শপথের সাথে উকিলের কথা গ্রহণ করা হবে। কারণ সে আমানতদার। তবে যদি মুয়াক্কিল অকাট্য প্রমাণ (সাক্ষী) হাজির করতে পারে যে উকিল অবহেলা করেছে, তবে উকিল দায়ী হবে।

৪. মুয়াক্কিলের জন্য কেনা বস্তুর দায়: যদি উকিল মুয়াক্কিলের জন্য কোনো জিনিস কেনে এবং সেটি উকিলের হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই জিনিসের মূল্য উকিলকে দিতে হবে না, বরং মুয়াক্কিলকেই বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারণ উকিল কেবল মাধ্যম বা 'সাফির' হিসেবে কাজ করেছে।

৫. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, ওকালতি সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো 'আমানত' বা বিশ্বস্ততা। হানাফি ফিকহে উকিলকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ একে অপরকে সাহায্য করতে ভয় না পায়। যদি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যও উকিলকে জরিমানা করা হতো, তবে কেউ অন্যের কাজ করে দিত না। আবার মুয়াক্কিলের অধিকার রক্ষায় 'সীমোলঙ্ঘন'-এর ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র এই বিধানগুলো সমাজের অর্থনৈতিক লেনদেনে ভারসাম্য ও ইনসাফ নিশ্চিত করে।

القصاص : প্রতিশোধ/কিসাস

প্রশ্ন-৫২: শরীয়তের পরিভাষায় 'কিসাস' (প্রতিশোধ)-এর সংজ্ঞা দাও। ইসলামে কিসাসের বিধান দেওয়ার পেছনের উদ্দেশ্য কী?
(عرف "القصاص" شرعا - وما هي الحكمة من مشروعية القصاص في الإسلام؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়ত মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর বিধান আরোপ করেছে। নরহত্যা বা মানুষের শরীরের ক্ষতিসাধন করাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অপরাধ দমনের জন্য আল্লাহ তাআলা 'কিসাস' বা সমপরিমাণ প্রতিশোধের বিধান দিয়েছেন। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের গ্রন্থসমূহে কিসাসের সংজ্ঞা, শর্তাবলি এবং এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিসাস কেবল শাস্তি নয়, বরং এটি সমাজকে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত থেকে রক্ষা করার একটি শক্তিশালী নিরাময় ব্যবস্থা।

২. কিসাসের পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف القصاص): 'কিসাস' (القصاص) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** শব্দটি 'কাসস' (قص) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো— ১. **অনুসরণ করা:** কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করা। অপরাধী যেমন অপরাধ করেছে, শাস্তির ক্ষেত্রে ঠিক সেই পথ অনুসরণ করা হয় বলে একে কিসাস বলা হয়। ২. **কেটে ফেলা:** যেহেতু হত্যার বদলে হত্যা বা অঙ্গের বদলে অঙ্গ কাটা হয়। ৩. **সমপরিমাণ হওয়া:** অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান করা।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া' ও 'আস-সিরাজিয়া'র আলোকে কিসাসের সংজ্ঞা হলো: **" هُوَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْعُقُوبَةِ فِي الْقَتْلِ الْعَمَدِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ."** অর্থ: *"ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতির ক্ষেত্রে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান করাকে কিসাস বলে।"* সহজ কথায়, হত্যাকারীকে হত্যার বদলে হত্যা করা এবং আঘাতকারীকে আঘাতের বদলে অনুরূপ আঘাত করা।

৩. কিসাসের শরয়ী হুকুম: ইচ্ছাকৃত হত্যা (ক্বাতলে আমদ)-এর ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ করা বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের (ওলী) অধিকার এবং শাসকের জন্য তা কার্যকর করা ওয়াজিব, যদি না অভিভাবক ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: *"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান ফরজ করা হয়েছে।"* (সূরা বাকারা: ১৭৮)।

৪. ইসলামে কিসাস বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য ও হিকমত (الحكمة من مشروعية القصاص): আধুনিক অনেক মানবাধিকার কর্মী মৃত্যুদণ্ড বা কিসাসকে নিষ্ঠুরতা মনে করেন, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটিই সমাজের জন্য রহমত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এর মূল রহস্য উন্মোচন করেছেন এভাবে: **" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ"** অর্থ: *"হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"* (সূরা বাকারা: ১৭৯)। নিচে কিসাসের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হলো:

(ক) জীবনের নিরাপত্তা বিধান (حفظ النفس): কিসাসের বিধানে বাহ্যত একজনের প্রাণ নেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবে এর মাধ্যমে হাজারো মানুষের প্রাণ রক্ষা পায়। যখন কোনো ব্যক্তি জানবে যে, কাউকে হত্যা করলে তাকেও নিশ্চিতভাবে মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হবে, তখন সে হত্যার সাহস করবে না। ফলে সমাজ হত্যাযজ্ঞ থেকে মুক্ত থাকবে। এটিই আয়াতের মর্মার্থ—কিসাস বা মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে মানুষ হত্যা থেকে বিরত থাকে, ফলে উভয়ের জীবন রক্ষা পায়।

(খ) আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা (إقامة العدل): ন্যায়বিচারের দাবি হলো, অপরাধী যা করেছে, তাকে ঠিক সেই মাত্রার শাস্তি দেওয়া। লঘু পাপে গুরু দণ্ড বা গুরু পাপে লঘু দণ্ড অবিচার। হত্যাকারী যেহেতু অন্যকে জীবন থেকে বঞ্চিত করেছে, তাই ন্যায়বিচার হলো তাকেও জীবন থেকে বঞ্চিত করা। এর চেয়ে কম শাস্তি (যেমন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) নিহত ব্যক্তির জীবনের সঠিক মূল্য দিতে পারে না।

(গ) জিঘাংসা বা প্রতিশোধপরায়ণতা রোধ (تشفي الصدور): মানুষের স্বভাব হলো, যখন তাদের প্রিয়জনকে হত্যা করা হয়, তখন তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। যদি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে কিসাস কার্যকর না করে, তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়রা নিজেরাই হত্যাকারীকে (বা তার বংশের অন্য কাউকে) হত্যা করতে উদ্যত হয়। এতে বংশপরম্পরায় রক্তক্ষয়ী সংঘাত (যেমন জাহেলি যুগে হতো) চলতে থাকে।

কিসাসের মাধ্যমে রাষ্ট্র যখন হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়, তখন ভুক্তভোগী পরিবারের ক্ষোভ প্রশমিত হয় এবং তারা শান্তি পায়।

(ঘ) অপরাধ দমনে ভীতি সঞ্চার (الردع والزجر): কিসাস বা জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অপরাধীদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে। এটি কেবল ওই নির্দিষ্ট অপরাধীর শাস্তি নয়, বরং সমাজের অন্য সম্ভাব্য অপরাধীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

(ঙ) পরকালীন মুক্তি: দুনিয়ায় যদি অপরাধীর ওপর কিসাস কার্যকর করা হয়, তবে সেটি তার পাপের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। ফলে পরকালে সে আল্লাহর কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটিও অপরাধীর প্রতি ইসলামের এক ধরণের দয়া।

৫. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, কিসাস ইসলামি দণ্ডবিধির এক অনন্য নিদর্শন। এটি কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর উপায় নয়, বরং এটি সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার কবচ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে কিসাসের বিধানগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে একদিকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়, অন্যদিকে ক্ষমা ও আপোষের দরজাও খোলা থাকে। ইসলাম দেখিয়েছে যে, কখনো কখনো একটি প্রাণদণ্ড হাজারো প্রাণের নিশ্চয়তা দেয়।

প্রশ্ন-৫৩: প্রাণের ক্ষতি ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতির ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান ব্যাখ্যা কর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলি কী কী?
اشرح أحكام القصاص فيما دون النفس (في الأعضاء) - وما هي شروط (إجراء القصاص في الأعضاء؟

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে মানুষের জীবনের মতো তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অত্যন্ত সম্মানিত। যদি কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের অঙ্গহানি করে বা জখম করে, তবে ইসলামি শরীয়ত সেখানেও কিসাস বা অনুরূপ বদলা নেওয়ার বিধান রেখেছে। একে ফিকহের পরিভাষায় 'কিসাস ফী-মা দুনান নাফস' (প্রাণের চেয়ে নিম্নতর বিষয়ে কিসাস) বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে অপরাধীর প্রতি জুলুম না হয়।

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাসের বিধান (أحكام القصاص في الأطراف): আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন: **" وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ"** অর্থ: *"আর আমি তাদের জন্য বিধান দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমসমূহের বদলে অনুরূপ জখম (কিসাস)।"* (সূরা মায়েদা: ৪৫)। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে অন্যের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলে, তবে কাজীর নির্দেশে অপরাধীরও একই অঙ্গ কেটে ফেলা হবে।

৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলি (شروط القصاص في الأعضاء): প্রাণের কিসাসের চেয়ে অঙ্গের কিসাস কার্যকর করা অধিক জটিল। হানাফি মাযহাবে অঙ্গের কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। প্রধান শর্তগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) ইচ্ছাকৃত অপরাধ (আল-আমদ): অপরাধটি অবশ্যই ইচ্ছাকৃত হতে হবে। ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃত আঘাতে যদি কারো অঙ্গহানি হয়, তবে কিসাস নেওয়া যাবে না; বরং দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হবে।

(খ) সমতা বা সাদৃশ্য বজায় রাখা সম্ভব হওয়া (إمكان المماثلة): এটি অঙ্গের কিসাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। অপরাধী যতটুকু ক্ষতি করেছে, ঠিক ততটুকু ক্ষতি করা সম্ভব হতে হবে—কমও নয়, বেশিও নয়।

- **সন্ধিস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন করা:** হানাফি ফিকহবিদগণ বলেন, কেবল ওইসব অঙ্গেই কিসাস নেওয়া যাবে যা নির্দিষ্ট জোড়া বা সন্ধিস্থল (Joint) থেকে কাটা যায়। যেমন—কনুই থেকে হাত, কব্জি থেকে হাত, বা গোড়ালি থেকে পা।
- **অস্থির বা হাড়ের জখম:** যদি জখম হাড়ের মাঝখানে হয় (যেমন উরুর হাড় ভাঙা), তবে হানাফি মতে এতে কিসাস নেই। কারণ হাড় ভাঙার ক্ষেত্রে হুবহু সমান করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(গ) অঙ্গের সুস্থতা ও পূর্ণতা (السلامة والصحة): অপরাধীর অঙ্গটি ভিকটিমের অঙ্গের মতো বা তার চেয়ে ভালো হতে হবে।

- **অচল অঙ্গ:** যদি কেউ অন্যের একটি সুস্থ হাত কেটে ফেলে, আর অপরাধীর হাতটি অবশ বা প্যারালাইজড থাকে, তবে সেই অবশ হাত কাটা যাবে না (কারণ সুস্থ হাতের মূল্য বেশি)। এক্ষেত্রে দিয়াত দিতে হবে।

- তবে যদি কেউ অন্যের অবশ হাত কাটে, তবে অপরাধীর সুস্থ হাত কাটা যাবে (কারণ সুস্থ হাত অবশ হাতের চেয়ে উত্তম, আর অপরাধী নিজের ক্ষতি মেনে নিয়েছে)।

(ঘ) মৃত্যুঝুঁকি না থাকা (الأمن من التلف): অঙ্গের কিসাস নিতে গিয়ে অপরাধীর প্রাণহানির আশঙ্কা থাকা যাবে না। যদি এমন কোনো জখম হয় যা বা মস্তিষ্ক বা পেটের গভীরে (জায়েফাহ ও আম্মাহ), তবে সেখানে কিসাস নেওয়া হয় না। কারণ অনুরূপ জখম করতে গেলে অপরাধীর মারা যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, অথচ অপরাধ ছিল কেবল জখম করা, হত্যা নয়।

(ঙ) ডান-বামের সমতা: ডান হাতের বদলে ডান হাত এবং বাম হাতের বদলে বাম হাত কাটা হবে। যদি কেউ অন্যের ডান হাত কাটে, আর অপরাধীর ডান হাত না থাকে, তবে বাম হাত কাটা যাবে না। বরং দিয়াত দিতে হবে।

৪. বিশেষ কিছু অঙ্গের বিধান:

- **চোখ:** চোখের কিসাস নেওয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হানাফি মতে, যদি চোখের আলো নষ্ট করা হয় কিন্তু চোখের আকৃতি ঠিক থাকে, তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে অপরাধীর চোখের আলো নষ্ট করা যেতে পারে (যেমন—আয়না গরম করে বা লেজার দিয়ে), যাতে চোখের আকৃতি নষ্ট না হয়। তবে এটি ঝুঁকিপূর্ণ হলে দিয়াত দিতে হবে।

- **দাঁত:** দাঁতের বদলে দাঁত তোলা হবে। তবে দুধ-দাঁতের বদলে স্থায়ী দাঁত তোলা যাবে না।

- **চুল বা দাড়ি:** কেউ যদি কারো চুল বা দাড়ি উপড়ে ফেলে বা কেমিক্যাল দিয়ে নষ্ট করে দেয়, তবে এতে কিসাস নেই, কারণ এটি পুনরায় গজাতে পারে। তবে স্থায়ীভাবে নষ্ট হলে দিয়াত দিতে হবে।

৫. কিসাস রহিত হওয়ার কারণ: যদি অঙ্গ কাটার আগেই অপরাধীর ওই অঙ্গটি অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় বা কাটা পড়ে, তবে কিসাস বাতিল হয়ে যাবে এবং দিয়াতের দিকে চলে যাবে।

৬. উপসংহার (خاتمة): অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিসাসের বিধানটি ইনসাফ ও সতর্কতার এক চমৎকার উদাহরণ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' অনুযায়ী, যেখানেই সমপরিমাণ শাস্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব বা সীমালঙ্ঘনের ভয় থাকে, সেখানেই ইসলাম কিসাস থেকে সরে এসে দিয়াত বা আর্থিক জরিমানার বিধান দেয়। এর উদ্দেশ্য হলো—অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া, কিন্তু তার প্রতি অবিচার না করা। এটি ইসলামী দণ্ডবিধির মানবিক দিক ও বাস্তববাদিতার প্রমাণ।

প্রশ্ন-৫৪: কিসাস থেকে 'ক্ষমা' (আল-আফউ)-এর মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা কর। রায় দেওয়ার আগে ও পরে ক্ষমা করে দেওয়ার হুকুম কী?

تحدث عن مسألة "العفو" عن القصاص - وما هو حكم العفو بعد الحكم (وقبله؟

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম যদিও কিসাস বা প্রতিশোধের বিধান দিয়েছে, তথাপি এর চেয়েও বেশি উৎসাহিত করেছে ক্ষমা বা 'আফউ' (العفو)-এর প্রতি। আল্লাহ তাআলা কিসাসের আয়াতেই ক্ষমার পথ খোলা রেখেছেন। কিসাস হলো ন্যায়বিচার, আর ক্ষমা হলো ইহসান বা অনুগ্রহ। হত্যাকারীর জীবন নেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া—এই চূড়ান্ত ক্ষমতা নিহতের উত্তরাধিকারীদের হাতে দেওয়া হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে ক্ষমার ধরণ, সময় এবং এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা অপরাধ ও ক্ষমার ভারসাম্যের প্রতীক।

২. কিসাসে ক্ষমার পরিচয় ও গুরুত্ব (تعريف العفو وأهميته): 'আফউ' বা ক্ষমা অর্থ হলো—নিহত ব্যক্তির ওলী (অভিভাবক/উত্তরাধিকারী) কর্তৃক হত্যাকারীর ওপর থেকে কিসাস বা মৃত্যুদণ্ডের দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন: *"তবে যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয়, তার উচিত ভালো পন্থায় দিয়াত আদায় করা।"* (সূরা বাকারা: ১৭৮)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"সদকা করলে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করেন না।"*

৩. ক্ষমার প্রকারভেদ (أنواع العفو): কিসাসের ক্ষেত্রে ক্ষমা দুইভাবে হতে পারে: **১. বিনা বিনিময়ে ক্ষমা (العفو مجاناً):** ওলী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দিলেন, কোনো টাকা-পয়সা নিলেন না। এটি সর্বোচ্চ স্তরের ইহসান। ২. **বিনিময়ে ক্ষমা বা সন্ধি (العفو على مال/الصلح):** ওলী বললেন, "আমি কিসাস মাফ করলাম, তবে এর বদলে আমাকে দিয়াত (রক্তপণ) বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে।" এটিও জায়েয।

৪. রায় দেওয়ার আগে ও পরে ক্ষমার হুকুম (حكم العفو قبل الحكم وبعده): ক্ষমা বা আফউ কখন কার্যকর হবে, তা নিয়ে ফিকহী বিধান অত্যন্ত উদার। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ক্ষমার হুকুম নিম্নরূপ:

(ক) বিচারকের রায় দেওয়ার পূর্বে (قبل الحكم): মামলা চলাকালীন বা রায় দেওয়ার আগে যদি নিহতের ওলীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে বিচারক আর কিসাসের রায় দিতে পারবেন না। এমতাবস্থায় কিসাস বাতিল হয়ে যাবে।

(খ) বিচারকের রায় দেওয়ার পরে (بعد الحكم): এমনকি বিচারক যদি মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে দেন, তবুও রায় কার্যকর করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ওলীদের ক্ষমা করার অধিকার থাকে।

- **জল্লাদের তলোয়ারের নিচে:** হানাফি ফিকহের কিতাবগুলোতে উল্লেখ আছে, এমনকি অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পর বা তলোয়ার উঠানোর পরও যদি ওলী বলে "আমি তাকে মাফ করলাম", তবে সাথে সাথে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত হয়ে যাবে। কারণ কিসাস হলো 'বান্দার হক', বান্দা মাফ করলে তা মাফ হয়ে যায়।

৫. একাধিক ওলীর ক্ষেত্রে ক্ষমার বিধান: যদি নিহত ব্যক্তির একাধিক উত্তরাধিকারী থাকে (যেমন—স্ত্রী, সন্তান, বাবা), এবং তাদের মধ্য থেকে **একজনও** যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে হানাফি মাযহাব মতে **পুরো কিসাস বাতিল হয়ে যাবে**।

- **হুকুম:** এক্ষেত্রে হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা পাবে। তবে যারা ক্ষমা করেনি, তাদের হকের কী হবে? হানাফি মতে, হত্যাকারীকে তখন বাকি ওলীদের অংশের দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে।

- **উদাহরণ:** এক ব্যক্তির দুই ছেলে। পিতাকে হত্যার পর এক ছেলে হত্যাকারীকে মাফ করল, অন্যজন চাইল ফাঁসি। হানাফি মতে, এক ছেলের মাফের কারণে ফাঁসি হবে না। হত্যাকারী দ্বিতীয় ছেলেকে অর্ধেক দিয়াত দেবে।

৬. ক্ষমার শব্দাবলী (আলফাজুল আফউ): ক্ষমা কার্যকর হওয়ার জন্য স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন—"আমি মাফ করলাম", "কিসাস ছেড়ে দিলাম", "তাকে দিয়াত থেকে মুক্ত করলাম" ইত্যাদি। এমনকি ওলী যদি হত্যাকারীর সাথে আপোষে কিছু পানাহার করে বা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে যা ক্ষমার ইঙ্গিত দেয়, তবে তাও ক্ষমা হিসেবে গণ্য হতে পারে (শর্তসাপেক্ষে)।

৭. ক্ষমা পরবর্তী অবস্থা: একবার ক্ষমা করার পর ওলী আর তার মত পাল্টাতে পারবে না। অর্থাৎ, "মাফ করলাম" বলার পর আবার "আমি কিসাস চাই" বলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অধিকার একবার ছেড়ে দিলে তা আর ফিরে আসে না (আল-সাকিত লা ইয়াউদ)।

৮. উপসংহার (خاتمة): কিসাসের বিধানের মধ্যে ক্ষমার এই সুযোগ ইসলামি বিচার ব্যবস্থাকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম রক্তপাত পছন্দ করে না, বরং সংশোধনের সুযোগ দেয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে দেখা যায়, ক্ষমার বিধানটি কেবল অপরাধীর প্রাণই বাঁচায় না, বরং বিবাদমান দুটি পরিবারের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনে। রায় কার্যকর হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমার এই সুযোগ, মানুষের প্রাণের মূল্যের প্রতি ইসলামের শ্রদ্ধাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

الفرائض : ফারাইয/উত্তরাধিকার

প্রশ্ন-৫৫: শরীয়তের পরিভাষায় 'ফারাইয' (উত্তরাধিকার) এবং 'মিরাস'-এর সংজ্ঞা দাও। মিরাসের রুকন (মৌলিক উপাদান) ও শর্তাবলি কী কী?
(عرف "الفرائض" و "الإرث" شرعا - وما هي أركان الإرث وشروطه؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অধ্যায় হলো 'ইলমুল ফারাইয' বা উত্তরাধিকার আইন। মানুষের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ কীভাবে বণ্টন হবে, আল্লাহ তাআলা তা পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। এটি এমনই এক বিজ্ঞান, যাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) 'নিসফুল ইলম' বা জ্ঞানের অর্ধেক বলেছেন। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই বণ্টন ব্যবস্থা, উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা এবং শর্তাবলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আলোচিত হয়েছে। মিরাসের বিধান সঠিকভাবে জানা ও মানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য, নতুবা সমাজে অবিচার ও ফিতনা সৃষ্টি হয়।

২. 'ফারাইয' ও 'মিরাস'-এর সংজ্ঞা (تعريف الفرائض والإرث):

(ক) ফারাইয (الفرائض):

- **আভিধানিক অর্থ:** শব্দটি 'ফরীযাহ' (فريضة)-এর বহুবচন। এর মূলধাতু 'ফরজ' (فرض), যার অর্থ হলো—নির্ধারণ করা (التقدير), কেটে নেওয়া (القطع), বা আবশ্যক করা। যেহেতু উত্তরাধিকারের অংশগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং মোট সম্পদ থেকে কেটে নেওয়া হয়, তাই একে ফারাইয বলা হয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** ফিকহবিদগণের মতে: **" عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ."** অর্থ: *"এমন জ্ঞান যার মাধ্যমে জানা যায় কে উত্তরাধিকারী হবে, কে হবে না এবং প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ কতটুকু।"*

(খ) মিরাস বা ইরস (الميراث / الإرث):

- **আভিধানিক অর্থ:** এর অর্থ হলো—একজনের থেকে অন্যজনের দিকে স্থানান্তরিত হওয়া বা বাকি থাকা। আল্লাহ তাআলার নাম 'আল-ওয়ারিস' (সবাই ধ্বংস হওয়ার পর যিনি বাকি থাকবেন)।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা: "إِنْتِقَالُ مِلْكِيَّةِ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ شَرْعًا."** অর্থ: *"মৃত ব্যক্তির মালিকানা শরীয়তসম্মত পন্থায় তার জীবিত উত্তরাধিকারীদের নিকট স্থানান্তরিত হওয়াকে মিরাস বলে।"*

৩. মিরাস বা উত্তরাধিকারের রুকনসমূহ (أركان الإرث): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি রুকন বা স্তম্ভ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এর কোনো একটি না থাকলে মিরাস সাব্যস্ত হবে না।

১. **আল-মুয়াররিস (الْمُوَرِّث):** যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যার সম্পদ বণ্টন করা হবে (মৃত ব্যক্তি)।

২. **আল-ওয়ারিস (الْوَارِث):** যিনি মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখেন এবং সম্পদ লাভের হকদার (জীবিত উত্তরাধিকারী)।

৩. **আল-মাউরূস (الْمَوْرُوث):** মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ বা ত্যাজ্যবিত্ত (তরিকাহ)। একে 'হক'ও বলা হয়।

৪. মিরাস শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط الإرث): উত্তরাধিকার আইন কার্যকর হওয়ার জন্য এবং একজন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি। এই শর্তগুলো হলো:

(ক) মুয়াররিসের মৃত্যু (مَوْتُ الْمُوَرِّثِ): যার সম্পদ বণ্টন করা হবে, তার মৃত্যু নিশ্চিত হতে হবে। মৃত্যু তিন প্রকার হতে পারে:

- **হাকিকী মৃত্যু (الموت الحقيقي):** বাস্তবে মৃত্যুবরণ করা এবং তা দেখা বা সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া।
- **হুকুমী মৃত্যু (الموت الحكمي):** বিচারক কর্তৃক মৃত ঘোষণা করা। যেমন—কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ (মাফকুদ) হলে এবং দীর্ঘকাল ফিরে না এলে বিচারক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
- **তাকদিরী মৃত্যু (الموت التقديري):** যেমন—কারো আঘাতের ফলে মায়ের পেটের সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া। এখানে ভ্রূণের মৃত্যু ধরে নিয়ে দিয়াত (রক্তপণ) বণ্টন করা হয়।

(খ) ওয়ারিসের জীবিত থাকা (حَيَاةُ الْوَارِثِ): মুয়াররিসের মৃত্যুর মুহূর্তে ওয়ারিসকে অবশ্যই জীবিত থাকতে হবে।

- **হাকিকী জীবন:** মুয়াররিস মারা যাওয়ার সময় ওয়ারিস সশরীরে জীবিত ছিল।
- **তাকদিরী জীবন:** যেমন—মায়ের পেটে থাকা ভ্রূণ (হামল)। যদি পিতা মারা যায় এবং সন্তান মায়ের পেটে থাকে, তবে সে জীবিত হিসেবে গণ্য হবে এবং মিরাস পাবে (শর্তসাপেক্ষে)।
- **শর্ত:** মুয়াররিস ও ওয়ারিস যদি একসাথে মারা যায় (যেমন—বিমান দুর্ঘটনা বা ধসে পড়া ভবনে) এবং কে আগে মারা গেছে তা জানা না যায়, তবে হানাফি ফিকহ মতে **"لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ"** (কেউ কারো থেকে মিরাস পাবে না)। তাদের সম্পদ মূল ওয়ারিসদের কাছে চলে যাবে।

(গ) আত্মীয়তার সম্পর্ক জানা থাকা (الْعِلْمُ بِجِهَةِ الْإِرْثِ): বিচারক বা বণ্টনকারীকে জানতে হবে যে, মৃতের সাথে ওয়ারিসের সম্পর্ক কী (স্বামী, স্ত্রী, সন্তান না ভাই)। সম্পর্ক স্পষ্ট না হলে মিরাস দেওয়া যাবে না।

৫. উত্তরাধিকার লাভের কারণসমূহ (أسباب الإرث): কোন কোন কারণে মানুষ উত্তরাধিকারী হয়? শরীয়তে এর কারণ তিনটি:

১. **বংশীয় সম্পর্ক (القرابة/النسب):** যেমন—পিতা-পুত্র, ভাই-বোন।

২. **বৈবাহিক সম্পর্ক (النكاح الصحيح):** সহিহ আকদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক।

৩. **ওয়ালা (الولاء):** দাসমুক্তির সম্পর্ক (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

৬. উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ (موانع الإرث): শর্ত পূরণ হওয়ার পরেও কিছু কারণে মানুষ মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়। প্রধান কারণগুলো হলো:

- **দাসত্ব (الرق):** দাস কোনো সম্পদের মালিক হতে পারে না।
- **হত্যা (القتل):** যদি ওয়ারিস মুয়াররিসকে হত্যা করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا"** (হত্যাকারী কোনো কিছুর উত্তরাধিকারী হয় না)।

- **ধর্মের ভিন্নতা (اختلاف الدين):** মুসলিম অমুসলিমের এবং অমুসলিম মুসলিমের ওয়ারিস হয় না। হাদিসে এসেছে: **" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ."**

৭. মিরাস বণ্টনের পূর্বের দায়িত্ব (الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ): সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করার আগে চারটি কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে: ১. কাফন-দাফনের খরচ মেটানো। ২. ঋণ পরিশোধ করা (আল্লাহর ঋণ ও বান্দার ঋণ)। ৩. ওসিয়ত পূরণ করা (এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে)। ৪. অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা।

৮. উপসংহার (خاتمة): উত্তরাধিকার আইন ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তি। এটি কোনো মানবসৃষ্ট আইন নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত 'ফরীযাহ'। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'য় এই শর্ত ও রুকনগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে কেউ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রাস করতে না পারে। মৃত ব্যক্তির প্রকৃত মৃত্যুর প্রমাণ এবং জীবিত ওয়ারিসের নিশ্চিত উপস্থিতি ছাড়া মিরাস বণ্টন করলে তা জুলুম হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-৫৬: 'আসহাবুল ফুরূয' (নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী) কারা? হানাফী ফিকহে তাদের নির্ধারিত অংশগুলো কী কী?

(من هم "أصحاب الفروض"؟ وما هي أقسامهم وأنصبتهم المقررة في الفقه الحنفي؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইলমুল ফারাইয বা উত্তরাধিকার শাস্ত্রে ওয়ারিসদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম শ্রেণি হলো 'আসহাবুল ফুরূয' বা 'যাবিল ফুরূয'। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে যাদের অংশ ভগ্নাংশ আকারে (যেমন—অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারাই এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মিরাস বণ্টনের সময় সবার আগে এদের অংশ দিতে হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে আসহাবুল ফুরূযের তালিকা এবং তাদের বিভিন্ন অবস্থায় অংশের পরিবর্তনগুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২. 'আসহাবুল ফুরূয'-এর পরিচয় (تعريف أصحاب الفروض):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'আসহাব' মানে অধিকারীগণ, আর 'ফুরূয' হলো 'ফরজ'-এর বহুবচন, যার অর্থ নির্ধারিত অংশ।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহবিদগণের মতে: **" هُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."** অর্থ: *"তারা হলেন ওই সকল উত্তরাধিকারী, যাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কিতাবে বা রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহে নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ রয়েছে।"* বণ্টনের সময় আসাবা (অবশিষ্টাংশভোগী) বা অন্যদের আগে এদের হক আদায় করা ওয়াজিব।

৩. আসহাবুল ফুরূযের সংখ্যা ও তালিকা: আসহাবুল ফুরূযের মোট সংখ্যা ১২ জন। এর মধ্যে ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন নারী।

- **পুরুষ ৪ জন:** ১. পিতা (الأب), ২. দাদা (الجد الصحيح), ৩. বৈপিত্রেয় ভাই (الأخ لأم), ৪. স্বামী (الزوج)।

- **নারী ৮ জন:** ১. স্ত্রী (الزوجة), ২. কন্যা (البنت), ৩. পৌত্রী/ছেলের মেয়ে (بنت الابن), ৪. সহোদরা বোন (الأخت الشقيقة), ৫. বৈমাত্রেয় বোন (الأخت لأب), ৬. বৈপিত্রেয় বোন (الأخت لأم), ৭. মা (الأم), ৮. দাদী/নানী (الجدة الصحيحة)।

৪. পবিত্র কুরআনে নির্ধারিত অংশসমূহ (الفروض المقدرة): কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট অংশ বা ভগ্নাংশ হলো মোট ৬টি। এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- **প্রথম ভাগ:** ১/২ (অর্ধেক), ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ), ১/৮ (এক-অষ্টমাংশ)।

- **দ্বিতীয় ভাগ:** ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ), ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ), ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ)।

৫. আসহাবুল ফুরূযের বিস্তারিত অংশ ও হুকুম: নিচে প্রধান কয়েকজন আসহাবুল ফুরূযের অংশের বিবরণ দেওয়া হলো, যা 'আস-সিরাজিয়া' অনুসরণে বিন্যস্ত:

(ক) স্বামী (الزوج): তার অবস্থা ২টি।

১. **১/২ (অর্ধেক):** যদি মৃত স্ত্রীর কোনো সন্তান (ছেলে, মেয়ে বা ছেলের সন্তান) না থাকে। দলিল: **"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ"** (নিসা: ১২)।

২. **১/৪ (এক-চতুর্থাংশ):** যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে।

(খ) স্ত্রী (الزوجة): তার অবস্থা ২টি।

১. **১/৪ (এক-চতুর্থাংশ):** যদি মৃত স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে। দলিল: **"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ..."**

২. **১/৮ (এক-অষ্টমাংশ):** যদি স্বামীর সন্তান থাকে। একাধিক স্ত্রী থাকলেও এই ১/৮ বা ১/৪ অংশ তারা সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

(গ) পিতা (الأب): তার অবস্থা ৩টি।

১. **১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ):** যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র (ছেলে সন্তান) থাকে। এটি শুধু ফরজ অংশ।

২. **১/৬ + আসাবা:** যদি মৃতের শুধু কন্যা বা পৌত্রী থাকে। তখন পিতা ১/৬ অংশ পাবেন এবং বাকি সম্পদ আসাবা হিসেবে পাবেন।

৩. **শুধুমাত্র আসাবা:** যদি মৃতের কোনো সন্তান না থাকে, তবে পিতা আসাবা হিসেবে সমস্ত সম্পদ বা বাকি সম্পদ পাবেন।

(ঘ) কন্যা (البنت): তার অবস্থা ৩টি।

১. **১/২ (অর্ধেক):** যদি কন্যা একজন হয় এবং সাথে কোনো ভাই (পুত্র) না থাকে।

২. **২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ):** যদি কন্যা দুইজন বা তার বেশি হয় এবং ভাই না থাকে। দলিল: **"فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"**।

৩. **আসাবা:** যদি সাথে ভাই (মৃতের পুত্র) থাকে, তবে তারা 'লিজজাকারি মিসলু হাযযিল উনসায়াইন' (মেয়ের দিগুণ ছেলে) অনুপাতে আসাবা হয়ে সম্পদ পাবে।

(ঙ) মা (الأم): তার অবস্থা ৩টি।

১. **১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ):** যদি মৃতের কোনো সন্তান না থাকে এবং ভাই-বোন একের অধিক না থাকে।

২. **১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ):** যদি মৃতের সন্তান থাকে অথবা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন থাকে।

৩. **বাকি সম্পদের ১/৩:** বিশেষ দুটি মাসয়ালায় (উমারিয়্যাতাইন) - যখন স্বামী/স্ত্রী এবং পিতা থাকে।

(চ) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন (الإخوة لأم): এরা একমাত্র ওয়ারিস যাদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান পায়।

১. **১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ):** যদি একজন হয়।

২. **১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ):** যদি একাধিক হয়, তবে সবাই মিলে ১/৩ সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

৬. আসহাবুল ফুরূযের অগ্রাধিকার: মিরাস বণ্টনের সময় সর্বপ্রথম আসহাবুল ফুরূযের অংশ দেওয়া হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا"** অর্থ: *"নির্ধারিত অংশগুলো তাদের হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও।"* (বুখারী ও মুসলিম)। তাদের অংশ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা আসাবাদের (রক্তের সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়) দেওয়া হয়।

৭. উপসংহার (خاتمة): আসহাবুল ফুরূয হলেন মিরাস বণ্টনের মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলা নারী, দুর্বল আত্মীয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ককে সম্মান জানিয়ে তাদের অংশ কুরআনে সুনির্দিষ্ট করেছেন, যাতে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে না পারে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'-তে উল্লেখিত এই ১২ জনের অংশের হিসাব জানা ফারাইয শাস্ত্রের প্রথম পাঠ। এদের অংশের সঠিক প্রয়োগ ছাড়া মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন শরীয়তসম্মত হবে না।

প্রশ্ন-৫৭: 'যাবিল আরহাম' (রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়)-সম্পর্কে আলোচনা কর। হানাফী মাযহাবে তাদের উত্তরাধিকারের হুকুম কী এবং একজনকে উপর আরেকজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পদ্ধতি কী?

تحدث عن "ذوي الأرحام" - وما هو حكم إرثهم وتقديم بعضهم على بعض (في المذهب الحنفي؟

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির সকল আত্মীয়ই ওয়ারিস হয় না। প্রথমে 'আসহাবুল ফুরূয' এবং তারপর 'আসাবা' সম্পদ পায়। কিন্তু এমন অনেক নিকটাত্মীয় আছে যারা এই দুই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নয় (যেমন—মেয়ের সন্তান, বোনের ছেলে, মামা-খালা)। এদেরকে পরিভাষায় 'যাবিল আরহাম' বলা হয়। হানাফি ফিকহে, বিশেষ করে 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে যাবিল আরহামের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা এবং তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে, যা হানাফি মাযহাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

২. 'যাবিল আরহাম'-এর পরিচয় (تعريف ذوي الأرحام):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'যূ' (ذو) অর্থ ওয়ালা বা অধিকারী, এবং 'আরহাম' (أرحام) হলো 'রহিম' (رحم)-এর বহুবচন, যার অর্থ জরায়ু বা গর্ভ। অর্থাৎ জরায়ু সম্পর্কিত আত্মীয় বা রক্ত সম্পর্কীয় স্বজন।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:** হানাফি ফিকহ অনুযায়ী: "**هُمْ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ.**" অর্থ: *"মৃতের এমন সকল আত্মীয় যারা আসহাবুল ফুরূয (নির্ধারিত অংশের মালিক) নন এবং আসাবা (অবশিষ্টাংশভোগী)-ও নন।"* যেমন: মেয়ের সন্তান (নাতিন-নাতনি), বোনের সন্তান (ভাগিনা-ভাগনি), ফুফু, খালা, মামা এবং নানার পিতা (ফাসেদ দাদা)।

৩. হানাফি মাযহাবে তাদের উত্তরাধিকারের হুকুম (حكم توريثهم): যাবিল আরহামরা মিরাস পাবে কি না, এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

- **পূর্ববর্তী মত (জায়েদ বিন সাবিত রা., ইমাম মালিক ও শাফেয়ী):** তাদের মতে যাবিল আরহামরা মিরাস পাবে না। আসহাবুল ফুরূয বা আসাবা না থাকলে সম্পদ 'বায়তুল মাল' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ জমা হবে।

- **হানাফি মাযহাব ও বিশুদ্ধ মত (ওমর, আলী, ইবনে মাসউদ রা. এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.):** হানাফি মাযহাব মতে, যাবিল আরহামরা অবশ্যই উত্তরাধিকারী হবে, যদি আসহাবুল ফুরূয এবং আসাবা কেউ না থাকে। **শর্ত:** আসহাবুল ফুরূযের মধ্যে কেবল স্বামী বা স্ত্রী থাকলে তাদের অংশ দেওয়ার পর বাকি সম্পদ যাবিল আরহামরা পাবে।

দলিল: ১. আল্লাহ তাআলা বলেন: **" وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ"** অর্থ: *"আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা একে অপরের (উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে) বেশি হকদার।"* (সূরা আনফাল: ৭৫)। ২. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ"** অর্থ: *"যার কোনো ওয়ারিস নেই, মামা তার ওয়ারিস।"* (যেহেতু মামা যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত)।

৪. যাবিল আরহামের শ্রেণিবিভাগ (أصناف ذوي الأرحام): 'আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুবিধার্থে যাবিল আরহামদের ৪টি শ্রেণিতে (Sinf) ভাগ করা হয়েছে:

১. **প্রথম শ্রেণি (الصنف الأول):** যারা মৃতের দিকে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মৃতের অধস্তন বংশধর।

- উদাহরণ: কন্যার সন্তান (নাতনি), পৌত্রীর সন্তান।

২. **দ্বিতীয় শ্রেণি (الصنف الثاني):** যাদের দিকে মৃত ব্যক্তি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মৃতের ঊর্ধ্বতন পুরুষ/নারী (যৌগিক পূর্বপুরুষ)।

- উদাহরণ: ফাসেদ দাদাগণ (নানার বাবা), ফাসেদ দাদীগণ (নানার মা)।

৩. **তৃতীয় শ্রেণি (الصنف الثالث):** যারা মৃতের পিতা-মাতার দিকে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভাই-বোনের বংশধর।

- উদাহরণ: বোনের সন্তান (ভাগিনা-ভাগনি), ভাইয়ের মেয়ে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান।

৪. **চতুর্থ শ্রেণি (الصنف الرابع):** যারা মৃতের দাদা-দাদীর দিকে সম্পৃক্ত।

- উদাহরণ: ফুফু, খালা, মামা, এবং বৈপিত্রেয় চাচা।

৫. অগ্রাধিকার দেওয়ার পদ্ধতি (طريقة التوريث والترجيح): একাধিক যাবিল আরহাম থাকলে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে? হানাফি ফিকহে এর জন্য তিনটি মূলনীতি (Priority Rules) অনুসরণ করা হয়:

(ক) শ্রেণি বা স্তর অনুযায়ী (الترجيح بالصنف): প্রথম শ্রেণির আত্মীয়রা দ্বিতীয় শ্রেণির চেয়ে উত্তম, দ্বিতীয় শ্রেণি তৃতীয় শ্রেণির চেয়ে, এবং তৃতীয় শ্রেণি চতুর্থ শ্রেণির চেয়ে উত্তম।

- **উদাহরণ:** যদি মৃতের 'মেয়ের মেয়ে' (১ম শ্রেণি) এবং 'খালা' (৪র্থ শ্রেণি) বেঁচে থাকে, তবে 'মেয়ের মেয়ে' পুরো সম্পদ পাবে। খালা কিছুই পাবে না।

(খ) নিকটবর্তী হওয়ার ভিত্তিতে (الترجيح بالدرجة): যদি সবাই একই শ্রেণির হয়, তবে যে মৃতের যত বেশি নিকটবর্তী (Generation wise closer), সে অগ্রাধিকার পাবে।

- **উদাহরণ:** 'মেয়ের মেয়ে' (২য় প্রজন্ম) এবং 'মেয়ের মেয়ের ছেলে' (৩য় প্রজন্ম)। এখানে 'মেয়ের মেয়ে' পুরো সম্পদ পাবে, কারণ সে মৃতের এক ধাপ কাছে।

(গ) আসাবার সন্তান বা শক্তিশালী রক্তের ভিত্তিতে (الترجيح بقوة القرابة): যদি শ্রেণি এবং স্তর দুটোই সমান হয়, তবে দেখা হবে কার রক্ত সম্পর্ক বেশি শক্তিশালী।

- **উদাহরণ:** ৩য় শ্রেণির ক্ষেত্রে—একজন 'সহোদরা বোনের মেয়ে' (বাপ-মা এক) এবং একজন 'বৈমাত্রেয় বোনের মেয়ে' (সৎ বোন)। এখানে সহোদরা বোনের মেয়ে অগ্রাধিকার পাবে, কারণ তার রক্ত সম্পর্ক (আকওয়া) বেশি শক্তিশালী।
- **আরেকটি নীতি:** যার সম্পর্ক কোনো ওয়ারিস (আসাবা বা ফুরূয)-এর মাধ্যমে, সে অগ্রাধিকার পাবে। যেমন—দাদার পিতা (যে আসাবার মাধ্যমে এসেছে) নানার পিতার চেয়ে অগ্রগণ্য।

৬. সম্পদ বণ্টনের নিয়ম (তাসমিয়াহ): হানাফি মতে, যাবিল আরহামদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে **'তানজিল' (التنزيل)** পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না (যা শাফেয়ীরা পরে গ্রহণ করেছে), বরং আত্মীয়তার নৈকট্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো— **"لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"** (মেয়ের

দিগুণ ছেলে পাবে), তবে এটি সব স্তরে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে যাবিল আরহামের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফের মধ্যে বণ্টনের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 'আস-সিরাজিয়া'-তে ইমাম মুহাম্মদের মতটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য ও জটিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. উপসংহার (خاتمة): যাবিল আরহামের উত্তরাধিকার হানাফি ফিকহের একটি মানবিক ও যৌক্তিক অধ্যায়। যেখানে নিকটাত্মীয় নেই, সেখানে দূরবর্তী আত্মীয় বা রক্ত সম্পর্কীয় স্বজনদের বঞ্চিত করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদ জমা না দিয়ে স্বজনদের দেওয়াটা কুরআনের মর্মবাণীর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে অগ্রাধিকারের যে সুশৃঙ্খল বিন্যাস (শ্রেণি, স্তর ও শক্তি) দেওয়া হয়েছে, তা মিরাস বণ্টনের জটিলতা দূর করে এবং আত্মীয়তার হক নিশ্চিত করে।

الخنثى : উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি

প্রশ্ন-৫৮: ইসলামী ফিকহে 'উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি' (আল-খুনসা)-এর সংজ্ঞা দাও। 'আল-খুনসা আল-মুশকিল' (অস্পষ্ট) এবং 'গাইরু আল-মুশকিল' (অস্পষ্টহীন)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

عرف "الخنثى" في الفقه الإسلامي - وما هو الفرق بين "الخنثى المشكل" و ("غير المشكل"؟

---

১. ভূমিকা (مقدمة): মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সাধারণত নারী ও পুরুষ—এই দুই শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: **" خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى"** (তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া—পুরুষ ও নারী)। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র লীলায় কখনো এমন মানুষ জন্ম নেয়, যার মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের দৈহিক গঠন বা চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। ইসলামি ফিকহে এই শ্রেণির মানুষকে 'খুনসা' বা হিজড়া বলা হয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের গ্রন্থসমূহে এদের উত্তরাধিকার, ইবাদত এবং সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এদের শারীরিক অবস্থার ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে ফিকহবিদগণ এদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, যা জানা একজন মুফতি বা বিচারকের জন্য অপরিহার্য।

২. 'আল-খুনসা'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الخنثى): 'খুনসা' শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** শব্দটি 'খুনস' (خُنْث) মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো—নমনীয়তা, কোমলতা বা ভেঙে পড়া (اللين والانكسار)। যেহেতু এই শ্রেণির মানুষের কথাবার্তা ও আচরণে এক ধরণের কোমলতা বা নারীসুলভ ভাব থাকে, তাই এদের 'খুনসা' বলা হয়।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** ফুকাহায়ে কিরাম, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী: **" هُوَ مَنْ لَهُ آلَةُ الرِّجَالِ وَآلَةُ النِّسَاءِ أَوْ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَصْلًا بَلْ لَهُ ثُقْبَةٌ يَبُولُ مِنْهَا."** অর্থ: *"খুনসা হলো সেই ব্যক্তি যার মধ্যে পুরুষের অঙ্গ (লিঙ্গ) এবং নারীর অঙ্গ (যোনি) উভয়টি বিদ্যমান অথবা যার মধ্যে এর কোনোটিই নেই, বরং কেবল একটি ছিদ্র আছে যা দিয়ে সে প্রস্রাব করে।"*

৩. আল-খুনসা আল-মুশকিল ও গাইরু আল-মুশকিলের পরিচয়: শারীরিক চিহ্ন এবং লিঙ্গ নির্ধারণের স্পষ্টতার ওপর ভিত্তি করে খুনসাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(ক) আল-খুনসা গাইরু আল-মুশকিল (الخنثى غير المشكل): যাকে 'খুনসা ওয়াজিহ' বা স্পষ্ট হিজড়াও বলা হয়।

- **সংজ্ঞা:** যার মধ্যে নারী বা পুরুষের যেকোনো একটি দিকের আলামত প্রবল বা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ফলে তাকে নিশ্চিতভাবে নারী বা পুরুষ হিসেবে হুকুম দেওয়া যায়।
- **আরবি ইবারত:** "**هُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ الذُّكُورَةِ أَوِ الْأُنُوثَةِ فَيُلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا.**" অর্থাৎ, যার মধ্যে পুরুষত্ব বা নারীত্বের আলামত প্রকাশ পেয়েছে এবং তাকে যেকোনো এক পক্ষের সাথে যুক্ত করা হয়। যদি পুরুষের আলামত প্রবল হয় তবে সে পুরুষ, আর নারীর আলামত প্রবল হলে সে নারী। এদের নিয়ে ফিকহে কোনো জটিলতা নেই; তারা সাধারণ নারী বা পুরুষের মতোই উত্তরাধিকার ও ইবাদতের বিধান পালন করবে।

(খ) আল-খুনসা আল-মুশকিল (الخنثى المشكل): যাকে অস্পষ্ট হিজড়া বলা হয়। 'আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে মূলত এদের নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

- **সংজ্ঞা:** যার মধ্যে নারী ও পুরুষের আলামতগুলো পরস্পর বিরোধী বা সমান সমান, অথবা যার কোনো আলামত স্পষ্ট নয়, ফলে সে নারী না পুরুষ তা নিশ্চিত করা যায় না।
- **আরবি ইবারত:** "**هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَى أَرَجُلٌ هُوَ أَمْ امْرَأَةٌ لِتَعَارُضِ الْعَلَامَاتِ أَوْ خَفَائِهَا.**" অর্থাৎ, আলামতগুলোর বিরোধ বা অস্পষ্টতার কারণে জানা যায় না যে সে পুরুষ নাকি নারী। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও যদি লিঙ্গ নির্ধারণ করা না যায়, তবে সে আজীবন 'মুশকিল' বা অস্পষ্ট থেকে যায়।

৪. মুশকিল ও গাইরু মুশকিল-এর মধ্যে পার্থক্য (الفرق بينهما):

পার্থক্যের বিষয়	আল-খুনসা গাইরু আল-মুশকিল (স্পষ্ট)	আল-খুনসা আল-মুশকিল (অস্পষ্ট)
লিঙ্গ পরিচয়	এর লিঙ্গ নির্ধারিত (নারী অথবা পুরুষ)।	এর লিঙ্গ অনির্ধারিত ও সন্দেহের মধ্যে থাকে।

আলামত	প্রস্রাবের স্থান বা শারীরিক পরিবর্তন দ্বারা স্পষ্ট।	আলামতগুলো সাংঘর্ষিক বা অনুপস্থিত।
উত্তরাধিকার (মিরাস)	নারী হলে নারীর অংশ, পুরুষ হলে পুরুষের অংশ পাবে।	হানাফি মতে, **"لَهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ"** (সে নারী ও পুরুষের অংশের মধ্যে যেটা কম, সেটা পাবে)।
নামাযের স্থান	পুরুষ হলে পুরুষদের কাতারে, নারী হলে নারীদের কাতারে দাঁড়াবে।	পুরুষ ও নারীদের মাঝখানের কাতারে দাঁড়াবে (সতর্কতাস্বরূপ)।
বিবাহ	পুরুষ সাব্যস্ত হলে নারীর সাথে, নারী সাব্যস্ত হলে পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয।	তার বিবাহ জায়েয নেই, কারণ তার লিঙ্গ নিশ্চিত নয়।
সাক্ষ্যদান	সাধারণ নারী বা পুরুষের মতোই গ্রহণযোগ্য।	কিছু ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গ্রহণ নিয়ে মতভেদ আছে।

৫. ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি: হানাফি ফিকহে 'গাইরু মুশকিল' বা স্পষ্ট খুনসাকে কোনো পৃথক শ্রেণি ধরা হয় না; বরং তাকে তার প্রবল লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু 'খুনসা মুশকিল'-এর ক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ 'ইহতিয়াত' বা সতর্কতার নীতি অবলম্বন করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ইবাদত ও মিরাসের ক্ষেত্রে তাকে সর্বনিম্ন সুবিধা দেওয়া হয় যাতে অন্যের অধিকার নষ্ট না হয়।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, 'খুনসা' মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। 'গাইরু মুশকিল' হলো যার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে, আর 'মুশকিল' হলো যার সমস্যা বা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র আলোকে এই পার্থক্য নিরূপণ করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই বিবাহ, মিরাস, পর্দা এবং জানাযার মতো গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী বিধানগুলো আবর্তিত হয়।

প্রশ্ন-৫৯: অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য কোন কোন চিহ্ন বা আলামতের উপর নির্ভর করা হয়? এবং কখন তাকে পুরুষ বা নারী হিসেবে গণ্য করা হয়?

ما هي العلامات التي يعتمد عليها لتحديد جنس الخنثى المشكل؟ ومتى يتم (اعتباره ذكرا أو أنثى؟

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরীয়তে একজন মানুষের লিঙ্গ পরিচয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইবাদত, মুআমালাত (লেনদেন) এবং মিরাস (উত্তরাধিকার)—সবকিছুই নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো শিশু উভয় লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তখন ফিকহবিদগণ সুনির্দিষ্ট কিছু আলামত বা চিহ্নের মাধ্যমে তার লিঙ্গ নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এই চিহ্নগুলো 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহের অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই আলামতগুলো বয়সের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় বা স্পষ্ট হয়।

২. লিঙ্গ নির্ধারণের মূলনীতি (قاعدة تحديد الجنس): লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরাম মূলত প্রস্রাবের অঙ্গ এবং বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিস এ ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাকে যখন উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন: **"يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ."** অর্থ: *"সে যে অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে, তার ভিত্তিতেই তার মিরাস সাব্যস্ত হবে।"*

৩. লিঙ্গ নির্ধারণের আলামতসমূহ (العلامات المميزة): হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, আলামতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) শৈশবের আলামত এবং (খ) বয়ঃসন্ধিকালের আলামত।

(ক) শৈশব বা জন্মের সময়ের আলামত (علامات الصغر): শিশু জন্মের পর তার লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য প্রস্রাবের দিকে লক্ষ্য করা হয়। এখানে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

- **১. প্রস্রাবের স্থান (مَخْرَجُ الْبَوْلِ):** যদি শিশুটি কেবল পুরুষের অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে সে **'পুরুষ'** (গোলাম/যাকার)। আর যদি কেবল নারীর অঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে সে **'নারী'** (জারিয়া/উনসা)।

- **২. অগ্র-পশ্চাৎ (السَّبْقُ):** যদি উভয় অঙ্গ দিয়েই প্রস্রাব বের হয়, তবে দেখতে হবে কোন অঙ্গ দিয়ে **আগে** বের হচ্ছে। **আরবি ইবারত: " فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا اُعْتُبِرَ بِأَسْبَقِهِمَا."** (যদি উভয়টি দিয়ে প্রস্রাব করে, তবে যে অঙ্গ দিয়ে আগে বের হয় তা ধর্তব্য হবে)। যে অঙ্গ দিয়ে আগে প্রস্রাব বের হবে, সে অনুযায়ী তাকে হুকুম দেওয়া হবে।

- **৩. পরিমাণ বা আধিক্য (الْكَثْرَةُ):** যদি উভয় অঙ্গ দিয়ে একসাথে প্রস্রাব বের হওয়া শুরু হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে দেখতে হবে কোন অঙ্গ দিয়ে **বেশি পরিমাণ** প্রস্রাব বের হয়। যার দ্বারা বেশি বের হবে, তাকেই আসল অঙ্গ ধরা হবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, শুধু 'আগে বের হওয়া' ধর্তব্য, পরিমাণ ধর্তব্য নয়। ফতোয়া ইমাম আবু হানিফার মতের ওপর হতে পারে যদি স্পষ্ট পার্থক্য থাকে।

(খ) বয়ঃসন্ধিকাল বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামত (علامات الكبر): শৈশবে যদি প্রস্রাবের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় বা অস্পষ্ট থাকে, তবে বালেগ হওয়ার পর শারীরিক পরিবর্তনের অপেক্ষা করা হয়। এ সময় যে আলামতগুলো দেখা যায়:

- **পুরুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার আলামত: ১. দাড়ি ওঠা (نَبَاتُ اللِّحْيَةِ):** মুখে দাড়ি বা গোঁফ দেখা দেওয়া। ২. **স্বপ্নদোষ হওয়া (الِاحْتِلَامُ):** পুরুষের মতো বীর্যপাত হওয়া। ৩. **নারীকে গর্ভবতী করা (الْإِحْبَالُ):** যদি সে কোনো নারীর সাথে মিলিত হয় এবং ওই নারী গর্ভবতী হয়। ৪. **পুরুষাঙ্গের উত্থান:** কামভাবের সময় পুরুষাঙ্গের দৃঢ়তা। **আরবি দলিল: " وَإِنْ ظَهَرَتْ لِحْيَتُهُ أَوْ أَحْبَلَ امْرَأَةً فَهُوَ رَجُلٌ."**

- **নারী হিসেবে গণ্য হওয়ার আলামত: ১. স্তনের বিকাশ (ظُهُورُ الثَّدْيِ):** নারীদের মতো স্তন বড় হওয়া এবং তাতে দুধ আসা (نُزُولُ اللَّبَنِ)। ২. **মাসিক হওয়া (الْحَيْضُ):** যোনিপথ দিয়ে ঋতুস্রাব বা হায়েজ আসা। এটি নারীত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ৩. **গর্ভবতী হওয়া (الْحَبَلُ):** যদি সে গর্ভধারণ করে। ৪. **যৌন মিলন:** পুরুষের সাথে নারীর মতো সংগম করার সক্ষমতা। **আরবি দলিল: " وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَزَلَ لَهُ لَبَنٌ أَوْ حَاضَ فَهُوَ امْرَأَةٌ."**

৪. যখন কোনো আলামতই কাজ করে না (حالة الإشكال الدائم): যদি বালেগ হওয়ার পরেও উপরের কোনো আলামত স্পষ্ট না হয়, অথবা আলামতগুলো পরস্পর বিরোধী হয় (যেমন—দাড়ি উঠল আবার মাসিকও হলো), তবে তাকে **'খুনসা মুশকিল'** (জটিল উভয় লিঙ্গ) হিসেবেই বহাল রাখা হবে। **হুকুম:** এমতাবস্থায় সে না পূর্ণ পুরুষ, না পূর্ণ নারী। তার ব্যাপারে শরীয়ত 'ইহতিয়াত' বা সতর্কতামূলক বিধান প্রয়োগ করবে। যেমন—উত্তরাধিকারে সে কম অংশ পাবে, জামাতে নামাযের সময় সে নারী-পুরুষের মাঝে দাঁড়াবে।

৫. আধুনিক ডিএনএ টেস্টের অবস্থান: যদিও প্রাচীন কিতাবে ডিএনএ বা ক্রোমোজোমের কথা নেই, কিন্তু আধুনিক হানাফি ফকীহগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষাকে 'আলামত' হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন, যদি তা নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়েকিন) দেয়। তবে বাহ্যিক আলামত (যেমন প্রস্রাব বা মাসিক) ফিকহী দৃষ্টিতে এখনো অগ্রাধিকার পায়।

৬. উপসংহার (خاتمة): লিঙ্গ নির্ধারণ কোনো অনুমাননির্ভর বিষয় নয়, বরং এটি শরয়ী দলিল ও বাস্তব আলামতের ওপর নির্ভরশীল। হানাফি ফিকহে এই আলামতগুলোর ক্রমধারা (প্রস্রাব -> অগ্রগামিতা -> বয়ঃসন্ধির চিহ্ন) অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো একটি দিক প্রবল না হয়, ততক্ষণ তাকে 'মুশকিল' গণ্য করে সতর্কতামূলক আমল করতে হয়, যাতে শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত না হয়।

প্রশ্ন-৬০: হানাফী ফিকহে 'উভয় লিঙ্গের ব্যক্তি' (আল-খুনসা)-এর পবিত্রতা ও নামায সম্পর্কিত বিধানাবলী ব্যাখ্যা কর।
(اشرح أحكام "الخنثى" المتعلقة بالطهارة والصلاة في الفقه الحنفي.)

১. ভূমিকা (مقدمة): 'খুনসা মুশকিল' বা অস্পষ্ট উভয় লিঙ্গের ব্যক্তির ইবাদত-বন্দেগি পালন করা সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ও জটিল। যেহেতু তার লিঙ্গ নিশ্চিত নয়, তাই তার ওপর পুরুষের হুকুম বা নারীর হুকুম—কোনটি বর্তাবে তা নিয়ে ফিকহবিদগণ সতর্কতামূলক পন্থা বা 'তরিকাতুল ইহতিয়াত' (طريقة الاحتياط) অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, যে পদ্ধতিতে আমল করলে তার ইবাদত নিশ্চিতভাবে আদায় হবে, সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-

সিরাজিয়া' ও হানাফি ফিকহে তার পবিত্রতা (তাহারাত) এবং নামায (সালাত) সম্পর্কিত বিধানগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

২. পবিত্রতা বা তাহারাত সম্পর্কিত বিধান (أحكام الطهارة):

(ক) ওযু (الوضوء): খুনসা মুশকিলের ওযু ভঙ্গের কারণগুলো পুরুষ ও নারীর সমন্বয়ে নির্ধারিত।

- যেহেতু তার দুটি পথ (নারী ও পুরুষের অঙ্গ), তাই যেকোনো একটি দিয়ে কিছু বের হলেই তার ওযু ভেঙে যাবে।
- **স্পর্শের বিধান:** যদি কোনো বেগানা পুরুষ বা নারী তাকে স্পর্শ করে, তবে ওযু ভাঙবে কি না—তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে সতর্কতা হলো ওযু করে নেওয়া।

(খ) গোসল (الغسل): গোসলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

- **বীর্যপাত:** যদি তার পুরুষাঙ্গ দিয়ে বীর্য বের হয় অথবা নারীর মতো উত্তেজনা অনুভূত হয়, তবে গোসল ফরজ হবে।
- **হুকুম:** যদি তার কোনো একটি অঙ্গ দিয়ে বীর্য বা স্রাব বের হয়, হানাফি মতে তাকে গোসল করতে হবে। কারণ সে হয়তো পুরুষ (বীর্যের কারণে) অথবা নারী (স্রাবের কারণে)।
- **আরবি মূলনীতি:** "الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ" (সন্দেহ দ্বারা নিশ্চিত বিষয় দূর হয় না)—এই নীতির ভিত্তিতে তার ওপর পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করা হয়।

৩. নামায সম্পর্কিত বিধান (أحكام الصلاة):

(ক) সতর বা আওরাত (ستر العورة): নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য সতর ঢাকা ফরজ। খুনসা মুশকিলের সতর কতটুকু?

- **হানাফি বিধান:** যেহেতু সে নারী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তাই নামাযের সময় তাকে **স্বাধীন নারীর মতো** সতর ঢাকতে হবে। অর্থাৎ, মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ছাড়া পুরো শরীর ঢাকতে হবে। এমনকি মাথার চুলও ঢাকতে হবে।

- **যুক্তি:** যদি তাকে পুরুষের মতো সতর ঢাকতে বলা হয় (নাভি থেকে হাঁটু), আর সে বাস্তবে নারী হয়, তবে তার নামায হবে না। কিন্তু যদি সে নারীর মতো সতর ঢাকে, তবে সে পুরুষ হলেও তার নামায হয়ে যাবে (কারণ অতিরিক্ত ঢাকা দোষের নয়)। একেই বলে 'ইহতিয়াত'।

- **আরবি ইবারত: "عَوْرَتُهُ كَعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ احْتِيَاطًا."**

(খ) জামাতে দাঁড়ানোর অবস্থান (موقف الخنثى في الصف): জামাতে নামায পড়ার সময় কাতারের বিন্যাস হানাফি ফিকহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুনসা মুশকিল কোথায় দাঁড়াবে?

- **কাতারের ক্রমধারা:** ১. পুরুষদের কাতার (সবার আগে)। ২. শিশুদের কাতার। ৩. **খুনসাদের কাতার (শিশুদের পরে এবং নারীদের আগে)**। ৪. নারীদের কাতার (সবার শেষে)।

- **আরবি ইবারত: "يَقِفُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَى ثُمَّ النِّسَاءُ."**

- **কারণ:** যদি সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়ায় এবং বাস্তবে নারী হয়, তবে তার পাশের পুরুষদের নামায ফাসিদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে (হানাফি মতে নারীরা পুরুষের পাশে দাঁড়ালে নামায নষ্ট হয়—মুহাযাতুন্নিসা)। আবার নারীদের কাতারে দাঁড়ালে, যদি সে পুরুষ হয়, তবে নারীদের সমস্যা হতে পারে। তাই তাদের অবস্থান মধ্যবর্তী স্থানে।

(গ) ইমামতি (الإمامة): খুনসা মুশকিল কি ইমাম হতে পারবে?

- **পুরুষদের ইমামতি:** খুনসা মুশকিল **কোনো পুরুষের ইমাম হতে পারবে না**। কারণ সে নারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর নারীর ইমামতি পুরুষের জন্য জায়েয নেই। **আরবি দলিল: "لَا يَؤُمُّ الرِّجَالَ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ."**

- **খুনসাদের ইমামতি:** সে অন্য খুনসাদের ইমামতি করতে পারবে কি না? হানাফি মতে, **পারবে না**। কারণ মুক্তাদি খুনসাটি পুরুষ এবং ইমাম খুনসাটি নারী হতে পারে।

- **নারীদের ইমামতি:** সে নারীদের ইমামতি করতে পারবে কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো মাকরূহ তাহরীমির সাথে জায়েয

হতে পারে, কিন্তু উচিত নয়। কারণ সে পুরুষ হলে নারীদের ইমামতি জায়েয, কিন্তু নারী হলে হানাফি মতে নারীদের জামাত মাকরূহ।

(ঘ) আযান ও ইকামতঃ খুনসা মুশকিলের আযান দেওয়া মাকরূহ। কারণ আযান দেওয়া পুরুষদের সুন্নাত, আর তার কণ্ঠস্বর নারীর মতো (আওরাত) হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৪. উপসংহার (خاتمة): পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, খুনসা মুশকিলের পবিত্রতা ও নামাযের বিধানে হানাফি ফিকহ সর্বোচ্চ সতর্কতার পরিচয় দিয়েছে। যেহেতু ইবাদত আল্লাহর হক, তাই এখানে শিথিলতার সুযোগ নেই। তাকে নারীর মতো পর্দা ও সতর রক্ষা করতে বলা হয়েছে, আবার ইমামতির মতো পুরুষের অধিকার থেকে বিরত রাখা হয়েছে—এ সবই তার ইবাদতকে সন্দেহমুক্ত রাখার প্রয়াস। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র এই বিধানগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন প্রতিটি মানুষের অবস্থার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বিধান প্রদান করে।

الحيل والمخارج : কৌশল ও শরয়ী সমাধান

প্রশ্ন-৬১: হানাফী ফিকহে 'শরীয়তসম্মত কৌশল' (আল-হিয়াল আল-শারইয়্যাহ)-এর সংজ্ঞা দাও। জায়েয এবং নিষিদ্ধ কৌশলের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড কী?
(عرف "الحيل الشرعية" في الفقه الحنفي - وما هو ضابط التفرقة بين الحيلة الجائزة والممنوعة؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের, বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ অধ্যায় হলো 'কিতাবুল হিয়াল' বা কৌশলের অধ্যায়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। মানুষ যখন কোনো বৈধ কাজ করতে গিয়ে আইনি জটিলতায় পড়ে অথবা কোনো কঠিন শপথ করে বিপদে পড়ে, তখন শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করাকে 'হিলা' বা কৌশল বলা হয়। তবে সব কৌশল বৈধ নয়; কিছু কৌশল আল্লাহর বিধানকে ফাঁকি দেওয়ার নামান্তর, যা হারাম। তাই জায়েয ও নিষিদ্ধ কৌশলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা একজন মুফতি ও ফকীহের জন্য অপরিহার্য।

২. 'আল-হিয়াল'-এর পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف الحيل): 'আল-হিয়াল' (الْحِيَلُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** শব্দটি 'হাওল' (حَوْلٌ) বা 'হিলাহ' (حِيلَةٌ) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো— নিপুণতা, বিচক্ষণতা, কোনো অবস্থা থেকে পরিবর্তনের ক্ষমতা বা উপায় বের করা। আরবি অভিধানে বলা হয়েছে: **" الْحِيلَةُ: هِيَ الْحِذْقُ وَجَوْدَةُ النَّظَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى دِقَّةِ التَّصَرُّفِ."** অর্থ: *"হিলা হলো কাজে নিপুণতা, গভীর দৃষ্টি এবং সূক্ষ্মভাবে কাজ আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষমতা।"*

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** হানাফী ফিকহবিদগণের মতে, বিশেষ করে ইমাম সারাখসী (রহ.) ও ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.)-এর মতে শরয়ী কৌশলের সংজ্ঞা হলো: **" هِيَ سُلُوكُ طَرِيقٍ خَفِيٍّ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْمَضَايِقِ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ إِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ إِحْقَاقِ بَاطِلٍ."** অর্থ: *"কোনো সত্যকে বাতিল না করে অথবা কোনো বাতিলকে সত্য না বানিয়ে,*

শরীয়তসম্মত গোপন বা সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করে আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার নামই হলো হিলা বা কৌশল।"

৩. হিয়াল বা কৌশলের শরয়ী ভিত্তি (مشروعية الحيل): হানাফী মাযহাবে শরীয়তসম্মত কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। এর দলিল হিসেবে পবিত্র কুরআনের হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়। তিনি অসুস্থ অবস্থায় কসম খেয়েছিলেন যে, সুস্থ হলে স্ত্রীকে ১০০টি বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর আল্লাহ তাঁকে দয়া করে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন: **" وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ"** অর্থ: *"তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত করো, আর শপথ ভঙ্গ করো না।"* (সূরা ছাদ: ৪৪)। এখানে ১০০টি বেতের বদলে ১০০টি শলাকা দিয়ে একবার আঘাত করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা প্রমাণ করে সংকট থেকে উত্তরণের জন্য কৌশল গ্রহণ করা বৈধ।

৪. কৌশলের প্রকারভেদ (أقسام الحيل): উদ্দেশ্য ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কৌশলকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) আল-হিলা আল-জায়েযাহ বা বৈধ কৌশল (الحيلة الجائزة): যে কৌশলের মাধ্যমে কোনো হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা যায় অথবা কোনো হক আদায় করা সহজ হয়।

- **উদাহরণ:** কেউ কসম খেল যে সে তার স্ত্রীকে 'তালাক' শব্দটি বলবে না। কিন্তু পরে তালাক দিতে চাইল। তখন সে উকিল নিয়োগ করে তালাক দেওয়াল। এতে তার কসমও ভাঙল না, তালাকও হয়ে গেল।

(খ) আল-হিলা আল-মামনুআ বা নিষিদ্ধ কৌশল (الحيلة الممنوعة): যে কৌশলের মাধ্যমে কোনো ওয়াজিব বাতিল করা হয় বা হারামে লিপ্ত হওয়া হয়। একে 'মাকরূহ' বা 'হারাম' কৌশল বলা হয়।

- **উদাহরণ:** যাকাত ফরজ হওয়ার বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সম্পদের মালিকানা নিজের স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করা, যাতে যাকাত দিতে না হয়। এটি আল্লাহর সাথে প্রতারণা।

৫. জায়েয ও নিষিদ্ধ কৌশলের পার্থক্যকারী মানদণ্ড (ضابط التفرقة): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফী উসুল অনুযায়ী, কোনো কৌশল বৈধ কি না,

তা যাচাই করার জন্য একটি মূলনীতি বা 'দাবিত' (ضابط) রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন: **" مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلْفِرَارِ عَنِ الْحَرَامِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَى الْحَلَالِ فَهُوَ حَسَنٌ، وَمَا كَانَ لِإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ لِخِدَاعٍ أَوْ لِإِسْقَاطِ فَرْضٍ فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ."**

পার্থক্যকারী মানদণ্ডসমূহ:

১. **উদ্দেশ্য (النية):** যদি উদ্দেশ্য হয় হারামে পতিত হওয়া থেকে বাঁচা (الفرار من الحرام), তবে তা জায়েয। আর যদি উদ্দেশ্য হয় কোনো ফরজ বিধান (যেমন যাকাত, ঋণ) বাতিল করা (إسقاط الواجب), তবে তা হারাম।

২. **ফলাফল (النتيجة):** কৌশলটি প্রয়োগের ফলে যদি কারো ক্ষতি না হয় এবং শরীয়তের কোনো মূলনীতি লঙ্ঘিত না হয়, তবে তা বৈধ। কিন্তু যদি এর মাধ্যমে অন্যের হক নষ্ট করা হয় (إبطال حق المسلم), তবে তা নিষিদ্ধ।

৩. **পদ্ধতি (الطريقة):** পদ্ধতিটি অবশ্যই বাহ্যিকভাবে শরীয়তসম্মত হতে হবে। যেমন—সূদ থেকে বাঁচার জন্য 'বাইয়ে মুরাবাহা'র পদ্ধতি অবলম্বন করা বৈধ, কিন্তু সূদকে 'মুনাফা' নাম দিয়ে খাওয়া হারাম কৌশল।

৬. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, হানাফী ফিকহে 'হিলা' বা কৌশল কোনো প্রতারণা নয়, বরং এটি ফিকহী প্রজ্ঞার (ফিকহী ফাতানাত) বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা চান না তাঁর বান্দারা কষ্টে নিপতিত হোক। তাই তিনি সংকটকালীন সময়ে উত্তরণের পথ বা 'মাখরাজ' খোলা রেখেছেন। তবে শর্ত হলো, সেই পথের উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ এবং পদ্ধতি হতে হবে শরীয়তসম্মত। যে কৌশল মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের ভেতরে রাখে তা 'মাহমুদ' (প্রশংসিত), আর যা আনুগত্য থেকে বের করে দেয় তা 'মাযমুম' (নিন্দিত)।

প্রশ্ন-৬২: শরীয়তসম্মত কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হয় (যেমন জটিলতা থেকে মুক্তির উপায়)?
ما هي الأهداف التي يراد تحقيقها من وراء استخدام الحيل الشرعية (كمخرج من الحرج)؟

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সহজীকরণের নীতি (Taysir)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: **" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"** (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না)। হানাফী ফিকহে 'হিয়াল' বা কৌশলের অধ্যায়টি মূলত এই আয়াতেরই বাস্তব প্রতিফলন। মানুষ যখন তার কথাবার্তা, শপথ বা লেনদেনে এমন কোনো পরিস্থিতিতে আটকে যায় যেখানে সোজা পথে চললে সে গুনাহগার হবে বা বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তখন 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র মতো ফিকহী গ্রন্থগুলো তাকে বৈধ উপায়ে মুক্তির পথ দেখায়। শরীয়তসম্মত কৌশল ব্যবহারের পেছনে বেশ কিছু মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

২. কৌশল ব্যবহারের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ (أهداف الحيل الشرعية): হানাফী ফকীহগণ কৌশল ব্যবহারের প্রধানত চারটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো:

(ক) সংকট ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি (المخرج من الضيق والحرج): মানুষ অনেক সময় রাগের বশে এমন কসম খেয়ে ফেলে যা পালন করা কঠিন, আবার ভঙ্গ করলে কাফফারা দেওয়াও তার সাধ্যের বাইরে। এমতাবস্থায় কৌশল ব্যবহার করে তাকে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করা হয়।

- **উদাহরণ:** এক ব্যক্তি কসম খেল, "আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক।" কিন্তু ঘরে প্রবেশ করা তার জন্য জরুরি।
- **কৌশল:** এমতাবস্থায় ফকীহগণ পরামর্শ দেন যে, সে তার স্ত্রীকে এক তালাক (তালাকে বায়েন) দিয়ে দিক। এরপর সে ঘরে প্রবেশ করুক। যেহেতু তখন সে তার স্ত্রী নয়, তাই কসমের শর্ত (তালাক পতিত হওয়া) বাস্তবায়িত হবে না। এরপর সে আবার স্ত্রীকে নতুন মহরে বিয়ে করে নেবে।
- **উদ্দেশ্য:** এখানে উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া নয়, বরং সংসার টিকিয়ে রাখা এবং কসমের কঠিন পরিণতি থেকে বাঁচানো।

(খ) হারাম থেকে বেঁচে থাকা (الفرار من الحرام): অনেক সময় সরাসরি কোনো কাজ করতে গেলে তা সুদের বা হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে বা ভিন্ন পদ্ধতিতে করলে তা হালাল হয়ে যায়। কৌশল ব্যবহারের এটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

- **উদাহরণ:** সুদী ঋণ থেকে বাঁচার জন্য 'বাইয়ে ইনাহ' (শর্তসাপেক্ষে) বা 'তাওয়াররুক' পদ্ধতি ব্যবহার করা। অথবা কোনো কিছু বিক্রি করার সময় এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া যাতে রিবা (সুদ) না হয়।
- **আরবি নীতি:** "نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ." অর্থ: *"হারাম থেকে পালিয়ে হালালের দিকে যাওয়া কতই না উত্তম কাজ।"*

(গ) হক বা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা (تحقيق الحق): কখনো কখনো প্রাপকের হক আদায়ে বাধা সৃষ্টি হয়। তখন কৌশল অবলম্বন করে সেই হক আদায় করা হয়।

- **উদাহরণ:** যদি কেউ ঋণ দিতে অস্বীকার করে এবং ঋণদাতার কাছে কোনো সাক্ষী না থাকে, কিন্তু ঋণগ্রহীতার কোনো আমানত বা সম্পদ ঋণদাতার হাতে থাকে। তখন সে কৌশলে সেই সম্পদ থেকে নিজের পাওনা উসুল করে নিতে পারে (মাসআলাতুজ জাফর)। এটি যদিও বাহ্যিকভাবে দখল মনে হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো নিজের হক আদায় করা।

(ঘ) চুক্তি বা লেনদেন শুদ্ধ করা (تصحيح العقود): লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ফাসিদ শর্তের কারণে পুরো চুক্তি বাতিল হওয়ার উপক্রম হয়। তখন কৌশল প্রয়োগ করে চুক্তিটিকে সহিহ করা হয়।

- **উদাহরণ:** শুফআ (প্রি-এমপশন) বা অগ্রক্রয়ের অধিকার রহিত করার জন্য বা বহাল রাখার জন্য হানাফী ফিকহে বিভিন্ন কৌশলের উল্লেখ আছে, যাতে বিবাদ এড়ানো যায়।

৩. কৌশল ব্যবহারের পদ্ধতিগত ভিত্তি: উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হানাফী মাযহাবে দুটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করা হয়:

১. **জাহিরী কাঠামোর পরিবর্তন:** অর্থাৎ কাজের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন করে দেওয়া।

২. **নিয়তের বিশুদ্ধতা:** অন্তরের নিয়ত ঠিক রেখে পথ পরিবর্তন করা। ইমাম সারাখসী (রহ.) বলেন: **" إِنَّمَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ إِذَا كَانَتْ لِإِسْقَاطِ حَقِّ الرَّجُلِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ لِلتَّخَلُّصِ عَنِ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ."** অর্থ: *"কৌশল তখনই মাকরূহ হয় যখন তা কারো হক নষ্ট করার জন্য হয়। কিন্তু যদি তা হারাম থেকে বাঁচার জন্য হয়, তবে তাতে কোনো দোষ নেই।"*

৪. উদ্দেশ্যের বিকৃতি রোধ: কৌশলের উদ্দেশ্য কখনোই আল্লাহর বিধানকে উপহাস করা হতে পারে না। ইহুদিরা শনিবারের মাছ শিকারের জন্য যে কৌশল করেছিল (গর্ত করে রাখা), তা ছিল হারাম। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নিষেধ অমান্য করা। কিন্তু মুসলিমরা যখন কৌশল করে, তাদের উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর হুকুমের ভেতরে থেকেই সমাধান বের করা। যেমন—সূর্যাস্তের পর ইফতার করা। এটিও এক ধরণের কৌশল যাতে রোজা ভঙ্গ না করে তৃষ্ণা মেটানো যায়, কিন্তু সময় হওয়ার পর।

৫. উপসংহার (خاتمة): পরিশেষে বলা যায়, শরীয়তসম্মত কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে সহজ করা এবং পাপ থেকে রক্ষা করা। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'য় বর্ণিত কৌশলগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন কোনো অচল বা স্থবির ব্যবস্থা নয়। এটি পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। মুফতি বা ফকীহের দায়িত্ব হলো, এই কৌশলগুলোকে কেবল 'জরুরত' বা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা, একে সাধারণ নিয়মে পরিণত না করা, যাতে মানুষ মূল বিধান পালনে অলস না হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন-৬৩: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়াহ' গ্রন্থ থেকে কসম বা লেনদেন অধ্যায়ের একটি জায়েয কৌশলের উদাহরণ ব্যাখ্যা কর।
اشرح مثالا لحيلة جائزة في باب الأيمان أو باب البيوع من كتاب الفتاوى السراجية.)

১. ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-হানাফী (রহ.) দৈনন্দিন জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বেশ কিছু চমকপ্রদ ফিকহী কৌশলের (Makharij) উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে 'কিতাবুল আইমান' (কসম অধ্যায়) এবং 'কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)-এ এমন অনেক পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেখানে মানুষ আটকে যায়। এখানে আমরা কসম

অধ্যায় থেকে একটি এবং লেনদেন অধ্যায় থেকে একটি—মোট দুটি উদাহরণ সংক্ষেপে আলোচনা করব, যা হানাফী ফিকহের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ দেয়।

২. কসম বা শপথ অধ্যায়ের একটি জায়েয কৌশলের উদাহরণঃ

(ক) সমস্যা (المشكلة): ধরা যাক, একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে রাগ করে কসম খেল: **"وَاللَّهِ لَا أُسَاكِنُكِ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَبَدًا."** অর্থ: *"আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে এই বাড়িতে কখনো বসবাস করব না।"* কিন্তু বাস্তবে তাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এবং সংসার ভাঙার উপক্রম হলো। এখন সে যদি ওই বাড়িতে থাকে, তবে তার কসম ভঙ্গ (হিনস) হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। আবার বাড়ি ছাড়লে সে বিপদে পড়বে।

(খ) শরয়ী সমাধান বা কৌশল (الحيلة الشرعية): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফী ফিকহে এর সমাধান হলো: ওই ব্যক্তি তার বাড়িটি তার স্ত্রীর কাছে বা অন্য কারো কাছে দান (হেবা) করে দেবে অথবা বিক্রি করে দেবে। যখন বাড়ির মালিকানা পরিবর্তন হয়ে যাবে, তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটি আর "এই বাড়ি" (তার মালিকানাধীন বাড়ি) থাকবে না, বরং সেটি অন্যের বাড়ি হয়ে যাবে। এরপর সে সেই বাড়িতে বসবাস করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

ফিকহী যুক্তি (التعليل الفقهي): কসমের ভিত্তি হলো মালিকানা বা সম্পর্কের ওপর। যখন সে বলেছিল "এই বাড়িতে", তখন বাড়িটি তার ছিল। যখন সে এটি বিক্রি করে দিল, তখন তার কসমের বিষয়বস্তু (Mahallul Yamin) পরিবর্তিত হয়ে গেল। হানাফী মূলনীতি হলো: **"إِنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِتَبَدُّلِ الْمِلْكِ."** (মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে কসমের বাধ্যবাধকতাও শেষ হয়ে যেতে পারে)।

৩. লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের একটি জায়েয কৌশলের উদাহরণঃ

(ক) সমস্যা (المشكلة): 'বাইয়ে ওফা' (بيع الوفاء) বা ঋণ ফেরত দিলে জমি ফেরত পাওয়ার শর্তে বিক্রি। অনেক সময় মানুষের টাকার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সে সুদ দিতে চায় না। আবার ঋণদাতাও কোনো লাভ ছাড়া ঋণ দিতে চায় না। তখন মানুষ জমি বন্ধক রাখে। কিন্তু বন্ধকি জমি থেকে ভোগ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি জটিল সমস্যা।

(খ) শরয়ী সমাধান বা কৌশল (الحيلة الشرعية): এর সমাধান হিসেবে হানাফী ফকীহগণ, বিশেষ করে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (যেমন ইমাম কাজিখান ও সিরাজুদ্দীন রহ.) 'বাইয়ে ওফা'-কে বৈধতা দিয়েছেন। **পদ্ধতি:** বিক্রেতা (ঋণগ্রহীতা) ক্রেতাকে (ঋণদাতা) বলবে, "আমি এই জমিটি আপনার কাছে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, যখন আমি মূল্য ফেরত দেব, আপনি জমিটি আমাকে ফেরত দেবেন।" এটি বাহ্যিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়, তাই ক্রেতা জমিটি ব্যবহার করতে পারবে (ফসলাদি খেতে পারবে), যা বন্ধক হলে পারত না। আবার বিক্রেতা টাকা ফেরত দিলে জমি ফিরে পাবে।

ফিকহী যুক্তি (التعليل الفقهي): যদিও এটি শর্তযুক্ত বিক্রি (যা সাধারণত ফাসিদ), কিন্তু মানুষের প্রয়োজন (উমুমুল বালওয়া) এবং সূদ থেকে বাঁচার জন্য এটিকে 'জায়েয' বা 'সহিহ' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আরবি ইবারত: **" بَيْعُ الْوَفَاءِ جَائِزٌ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَفِرَارًا مِنَ الرِّبَا."** অর্থ: *"পরবর্তী ফকীহদের মতে বাইয়ে ওফা জায়েয, মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে এবং সুদ থেকে বাঁচার জন্য।"*

৪. এই কৌশলগুলোর বৈধতার শর্ত: 'আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কৌশলগুলো তখনই বৈধ হবে যখন: ১. এর মাধ্যমে কোনো ওয়াজিব বাতিল করা হবে না। ২. এর মাধ্যমে হারামকে হালাল মনে করা হবে না, বরং হারামের বিকল্প খোঁজা হবে। ৩. উভয় পক্ষের সম্মতি থাকবে।

৫. উপসংহার (خاتمة): উপর্যুক্ত উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যায় যে, হানাফী ফিকহের দৃষ্টি কত গভীর। কসমের উদাহরণে দেখা যায় যে, মালিকানা পরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে একটি পরিবারকে ভাঙন থেকে রক্ষা করা যায়। আবার লেনদেনের উদাহরণে দেখা যায়, কীভাবে অর্থনীতির চাকা সচল রেখে সুদ থেকে বাঁচা যায়। এই কৌশলগুলো কোনো ধোঁকাবাজি নয়, বরং এগুলো হলো 'ইলম' বা জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ, যা মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যায়। যেমনটি ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেছিলেন: **"إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَنَا الرُّخْصَةُ مِنْ ثِقَةٍ."** (আমাদের মতে প্রকৃত জ্ঞান হলো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সহজ সমাধানের পথ বের করা)।

آداب المفتي والتنبيه على الجواب
মুফতির আদব ও ফাতাওয়ার উত্তরের প্রতি মনোযোগ

প্রশ্ন-৬৪: 'মুফতি' (ফাতওয়া প্রদানকারী) কে? হানাফী মাযহাবে ফাতওয়া প্রদানের জন্য তাঁর মধ্যে কোন কোন যোগ্যতা ও শর্তাবলি থাকা আবশ্যক?
من هو "المفتي"؟ وما هي شروط أهلية الإفتاء التي يجب توافرها فيه في (المذهب الحنفي؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তে 'ইফতা' বা ফতোয়া প্রদান একটি অত্যন্ত মহান ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব। মুফতি হলেন তিনি, যিনি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে দ্বীনের জটিল সমস্যার সমাধান দেন। এটি কেবল একটি পদবী নয়, বরং এটি একটি গুরুদায়িত্ব। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) মুফতিকে **"الْمُوَقِّعُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ"** (বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারী) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই হানাফী ফিকহে ফতোয়া প্রদানের জন্য মুফতির বিশেষ যোগ্যতা ও শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে দ্বীনের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।

২. মুফতির পরিচয় ও সংজ্ঞা (تعريف المفتي): 'মুফতি' (الْمُفْتِي) শব্দটি আরবি 'ইফতা' (إفتاء) মাসদার থেকে নির্গত। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

- **আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي):** শব্দটির মূল অর্থ হলো—কোনো বিষয় স্পষ্ট করা, নতুন কিছু প্রকাশ করা। ফতোয়া হলো প্রশ্নকারীর উত্তরে শরয়ী হুকুম স্পষ্ট করা। আরবিতে বলা হয়: **" أَفْتَاهُ فِي الْأَمْرِ: أَبَانَ لَهُ الْحُكْمَ."** (সে তাকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিল)।

- **পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي):** উসুলবিদ ও ফিকহবিদগণের মতে: **" هُوَ الْعَالِمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، الْمُخْبِرُ عَنْ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى لِمَنْ سَأَلَهُ دَلِيلًا لَا إِلْزَامًا."** অর্থ: *"মুফতি হলেন এমন আলেম যিনি শরয়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী এবং প্রশ্নকারীর নিকট আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করেন দলিলের ভিত্তিতে, বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে নয় (বিচারকের মতো)।"*

৩. ফাতওয়া প্রদানের যোগ্যতা ও শর্তাবলি (شروط أهلية الإفتاء): হানাফী মাযহাবে একজন ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য তার মধ্যে জ্ঞানগত

(ইলমী) এবং গুণগত (আমলী) উভয় ধরণের শর্ত থাকা আবশ্যক। এগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(ক) মৌলিক শর্তাবলি (الشروط الأساسية): ১. **ইসলাম (الإسلام):** মুফতিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের ফতোয়া মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ২. **বুদ্ধিমত্তা (العقل):** তাকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী বা 'আকিল' হতে হবে। পাগল বা মদ্যপ অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া জায়েয নেই। ৩. **প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ):** বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী বালেগ হওয়া শর্ত। যদিও কেউ কেউ 'মুমায়yiz' (বুদ্ধিমান) কিশোরের ফতোয়া জায়েয বলেছেন, তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো বালেগ হওয়া। ৪. **ন্যায়পরায়ণতা (العدالة):** মুফতিকে 'আদিল' হতে হবে, অর্থাৎ তিনি ফাসিক (পাপাচারী) হবেন না। তার কথা ও কাজের ওপর মানুষের আস্থা থাকতে হবে। **আরবি দলিল:** **"لَا تُقْبَلُ فَتْوَى الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ."** (ধর্মীয় বিষয়ে ফাসিকের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়)।

(খ) জ্ঞানগত শর্তাবলি (الشروط العلمية): একজন মুফতির জন্য গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী এর স্তরগুলো হলো:

- **১. কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান:** পবিত্র কুরআনের আয়াতুল আহকাম (বিধান সম্বলিত আয়াত) এবং রাসুল (সা.)-এর হাদিস সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞান থাকতে হবে।
- **২. ইজমা ও কিয়াসের জ্ঞান:** সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের ইজমা (ঐকমত্য) এবং কিয়াস (শরয়ী যুক্তি)-এর পদ্ধতি জানতে হবে।
- **৩. আরবী ভাষার দক্ষতা:** আরবী ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং শব্দের প্রয়োগরীতি সম্পর্কে পূর্ণ দখল থাকতে হবে, যাতে দলিলের মর্মার্থ বুঝতে ভুল না হয়।
- **৪. ফিকহী মাসায়েল ও মাযহাবের জ্ঞান:** হানাফী মুফতির জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর সাথীদের (সাহেবাইন) মতামত, তাঁদের মূলনীতি এবং মাযহাবের মধ্যে কোন মতটি 'প্রবল' (রাজেহ) এবং কোনটি 'দুর্বল' (মারজুহ)—তা জানা আবশ্যক। **আরবি ইবারত:** **" يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَذْهَبِ إِمَامِهِ، مُمَيِّزًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، عَارِفًا بِالرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ."**

(গ) বিশেষ শর্ত: মুজতাহিদ বনাম মুকাল্লিদ মুফতি: ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞায় মুফতিকে 'মুজতাহিদ' (যিনি সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করতে পারেন) হওয়া শর্ত করা হতো। কিন্তু পরবর্তী যুগে (মুতাআখখিরিন) হানাফী ফকীহগণ বলেন, বর্তমানে মুজতাহিদ পাওয়া দুষ্কর। তাই 'মুফতি মুকাল্লিদ' (যিনি মাযহাবের ইমামদের অনুসরণ করে ফতোয়া দেন)-এর ফতোয়া গ্রহণযোগ্য, যদি তিনি নিম্নলিখিত গুণে গুণান্বিত হন:

- **হিজফুল মাসায়েল (حفظ المسائل):** মাযহাবের মাসয়ালাগুলো তার নখদর্পণে থাকা।
- **ফিকহুন নাফস (فقه النفس):** তার মধ্যে ফিকহী মেধা ও প্রজ্ঞা থাকা।

(ঘ) যুগের চাহিদা ও প্রথা জানা (معرفة العرف والعادة): মুফতিকে তার সময়ের মানুষের অবস্থা, প্রচলিত প্রথা (উর্ফ) এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে মুফতি তার সমাজের প্রথা জানেন না, তিনি ভুল ফতোয়া দিতে পারেন। **ইমাম ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন: " الْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارٌ ... وَلِذَا صَارَ الْعِلْمُ بِهِ مِنْ شُرُوطِ الْمُفْتِي."** (শরীয়তে প্রথার গুরুত্ব আছে, তাই এটি জানা মুফতির শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত)।

৪. মুফতির আধ্যাত্মিক গুণাবলি: জ্ঞান ছাড়াও মুফতির অন্তরে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া), দুনিয়াবিমুখতা এবং গাম্ভীর্য (সাকিনাহ) থাকতে হবে। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: **"নূর বা জ্ঞান বেশি রেওয়ায়েত জানার নাম নয়, বরং এটি একটি আলো যা আল্লাহ মুত্তাকিদের অন্তরে ঢেলে দেন।"**

৫. উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি হলেন উম্মাহর পথপ্রদর্শক। হানাফী মাযহাব মতে, ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা কেবল কিতাব পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন গভীর পাণ্ডিত্য, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং আল্লাহভীতির এক সুষম সমন্বয়। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' বা এর মতো নির্ভরযোগ্য ফিকহী গ্রন্থ থেকে ফতোয়া দেওয়ার জন্য মুফতিকে অবশ্যই 'আসহাবুত তারজীহ' (প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন)-এর স্তরে পৌঁছাতে হবে।

প্রশ্ন-৬৫: ফাতওয়া প্রদানের সময় এবং ফাতওয়ার মজলিসে বসার ক্ষেত্রে মুফতির উপর ওয়াজিব কিছু আদব (যেমন: ইখলাস ও ধীরস্থিরতা) ব্যাখ্যা কর।
(اشرح بعض الآداب الواجبة على المفتي في حال الإفتاء والجلوس للفتوى (كالإخلاص والتأني).)

১. ভূমিকা (مقدمة): ফতোয়া প্রদান করা কেবল একটি জ্ঞানগত কসরত নয়, বরং এটি একটি ইবাদত। আর যেকোনো ইবাদত কবুল হওয়ার এবং ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য কিছু 'আদব' বা শিষ্টাচার মেনে চলা জরুরি। মুফতি যখন ফতোয়ার মসনদে বসেন, তখন তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আচরণ অত্যন্ত মার্জিত ও শরীয়তসম্মত হতে হবে। ফিকহ ও উসুলবিদগণ মুফতির জন্য বেশ কিছু আদব নির্দিষ্ট করেছেন, যা পালন করা তার জন্য ওয়াজিব বা মুস্তাহাব। এগুলোকে 'আদাবুল মুফতি' বলা হয়।

২. ফতোয়া প্রদানের আদবসমূহ (آداب الفتوى): মুফতির আদবগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: নিজের সত্তার সাথে, ফতোয়া গ্রহণকারীর (মুসতাফতি) সাথে এবং ফতোয়া লেখার বা দেওয়ার ক্ষেত্রে।

(ক) মুফতির নিজস্ব আদব (الآداب النفسية):

- **১. ইখলাস বা একনিষ্ঠতা (الإخلاص):** মুফতির প্রধান আদব হলো নিয়তের বিশুদ্ধতা। তিনি ফতোয়া দেবেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, মানুষের প্রশংসা বা পদমর্যাদা অর্জনের জন্য নয়। **আরবি দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"** (নিশ্চয়ই আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল)। ইমাম আন-নববী (রহ.) বলেন: **"যদি মুফতির নিয়ত শুদ্ধ না হয়, তবে তার ফতোয়া বা নূর মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলবে না।"**

- **২. তাকওয়া ও পরহেজগারি (التقوى والورع):** মুফতিকে অবশ্যই হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। তার ব্যক্তিগত আমল তার ইলমের সাক্ষ্য দেবে।

- **৩. গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা (الوقار والسكينة):** ফতোয়ার মজলিসে মুফতিকে অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্ত থাকতে হবে। চটুলতা, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা বা খেল-তামাশা মুফতির শানের খেলাফ।

(খ) ফতোয়া দেওয়ার সময়ের অবস্থা (الآداب حال الإفتاء): ফতোয়া দেওয়ার সময় মুফতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা শান্ত থাকা জরুরি। হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী বিচারক বা মুফতিকে নিম্নলিখিত অবস্থায় ফতোয়া দিতে নিষেধ করা হয়েছে: **আরবি হাদিস: "لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".** অর্থ: *"কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুইজনের মধ্যে ফয়সালা না করে।"* এর ওপর ভিত্তি করে ফকীহগণ বলেন, মুফতি ফতোয়া দেবেন না যখন তিনি:

- প্রচণ্ড রাগান্বিত (الغضب)।
- অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত (الجوع والعطش)।
- প্রচণ্ড চিন্তিত বা পেরেশান (الهم المزعج)।
- অসুস্থ বা তন্দ্রাচ্ছন্ন (المرض والنعاس)। কারণ এসব অবস্থায় সঠিক চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং ভুলের আশঙ্কা থাকে।

(গ) প্রশ্নকারীর সাথে আদব (الآداب مع المستفتي):

- **১. দয়া ও নম্রতা:** প্রশ্নকারীর সাথে কঠোর আচরণ করা যাবে না। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, যদিও সে অশিক্ষিত হয় বা প্রশ্নটি সাধারণ হয়। আল্লাহ বলেন: **"وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ"** (তুমি যদি কঠোর হৃদয়ের হতে তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত)।
- **২. প্রশ্ন বোঝা:** প্রশ্নকারীর ভাষা, উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট পুরোপুরি না বুঝে উত্তর দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে পাল্টা প্রশ্ন করে বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে হবে। একে **'ইস্তিফসিল' (الاستفصال)** বা বিস্তারিত জানা বলা হয়।

(ঘ) ফতোয়া লেখার বা বলার আদব (آداب الجواب):

- **১. স্পষ্টতা (الوضوح):** উত্তর হতে হবে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। যাতে সাধারণ মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে। কঠিন পরিভাষা পরিহার করা উচিত।
- **২. দলিল উল্লেখ করা:** উত্তরের সাথে কুরআন-সুন্নাহ বা ফিকহী কিতাবের দলিল উল্লেখ করা উত্তম, এতে মানুষের আস্থা বাড়ে।

- **৩. 'আল্লাহু আলাম' বলা:** উত্তরের শেষে সর্বদা **"والله أعلم بالصواب"** (আল্লাহই সঠিক জানেন) লেখা বা বলা মুফতির বিনয়ের পরিচয় এবং ভুলের দায়মুক্তি।

- **৪. তাআন্নি বা তাড়াহুড়া না করা (التأني):** জটিল বিষয়ে তাৎক্ষণিক উত্তর না দিয়ে সময় নেওয়া উচিত। ইমাম মালিক (রহ.) কখনো কখনো একটি মাসয়ালার উত্তরের জন্য কয়েকদিন সময় নিতেন এবং বলতেন, **"আমি ভেবে দেখি, কারণ আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড়াতে হবে।"**

(ঙ) 'লা-আদরি' (আমি জানি না) বলা: যে বিষয়ে মুফতির জ্ঞান নেই বা সন্দেহ আছে, সেখানে অকপটে "আমি জানি না" বলা ইলমের অর্ধেক। এটি লজ্জার বিষয় নয়, বরং এটি মুফতির আমানতদারিতার প্রমাণ। ফেরেশতারাও বলেছিলেন: **"سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا"**।

৩. উপসংহার (خاتمة): মুফতির আদবগুলো মূলত ইসলামের সৌন্দর্য। যখন একজন মুফতি ইখলাস, ধৈর্য, এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে ফতোয়া দেন, তখন তা কেবল একটি আইনি সমাধান থাকে না, বরং তা মানুষের জন্য হেদায়েতের আলো হয়ে ওঠে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র শিক্ষাও হলো—ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতিকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন-৬৬: ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য নন এমন ব্যক্তির ফাতওয়া দেওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা কর। জ্ঞান ছাড়া ফাতওয়া দেওয়ার খারাপ পরিণতিগুলো কী কী?
تحدث عن حكم الإفتاء لمن ليس أهلا للفتوى - وما هي الآثار السيئة المترتبة (على الإفتاء بغير علم؟

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে জ্ঞানার্জন ছাড়া কথা বলা, বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করাকে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বর্তমানে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান বা গভীর গবেষণা ছাড়াই ফতোয়া দিতে শুরু করেন, যা উম্মাহর জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। ফিকহ শাস্ত্র, বিশেষ করে হানাফী মাযহাবে 'অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া' (ইফতা বি-গাইরি ইলম)-কে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এমন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বয়কট বা নজরবন্দি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়ার হুকুম (حكم الإفتاء بغير علم): যিনি মুফতি হওয়ার শর্তাবলি পূরণ করেন না, তার জন্য ফতোয়া দেওয়া **'হারাম' (حرام)** এবং **'কবিরা গুনাহ'**। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর ওপর কথা বলাকে শিরকের সাথে তুলনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: **" قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ... وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ."** অর্থ: *"বলো, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীলতাকে... এবং (হারাম করেছেন) আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না।"* (সূরা আল-আরাফ: ৩৩)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন: **" مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ."** অর্থ: *"যাকে অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফতোয়া দেওয়া হলো (এবং সে ভুল আমল করল), তার গুনাহ ফতোয়া দাতার ওপর বর্তাবে।"* (সুনানে আবু দাউদ)।

৩. জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেওয়ার কুফল ও পরিণতি (الآثار السيئة المترتبة): অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া প্রদান ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। এর প্রধান কয়েকটি কুফল নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) নিজের ও অন্যের পথভ্রষ্টতা (الضلال والإضلال): যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেয়, সে নিজেও গোমরাহ হয় এবং অন্যকেও গোমরাহ করে। হাদিসে এসেছে, শেষ জমানায় মানুষ মূর্খদের নেতা বানাবে। **আরবি হাদিস: " فَيُسْأَلُونَ فَيُفْتُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ."** অর্থ: *"তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।"* (সহিহ বুখারী)।

(খ) আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ (الكذب على الله): ফতোয়া দেওয়া মানে বলা যে, "আল্লাহ এই বিষয়ে এই হুকুম দিয়েছেন।" অযোগ্য ব্যক্তি যখন ভুল ফতোয়া দেয়, সে মূলত আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে। আর এর শাস্তি জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন: **"وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ."** অর্থ: *"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে এ কথা বলো না যে, এটা হালাল আর ওটা হারাম।"* (সূরা নাহল: ১১৬)।

(গ) হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করা: অজ্ঞ মুফতি অনেক সময় মানুষের সুবিধার জন্য হারামকে হালাল বলে দেয় অথবা হালালকে হারাম করে মানুষের জীবন কঠিন করে তোলে। এটি দ্বীনের বিকৃতি বা 'তাহরিফ'-এর শামিল।

(ঘ) সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা (الفتنة والفوضى): ভুল ফতোয়ার কারণে পরিবার ভাঙ্গে (যেমন ভুল তালাকের ফতোয়া), সম্পদে অবিচার হয় (ভুল মিরাস বণ্টন) এবং সমাজে রক্তপাত বা উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে অনেক উগ্রবাদী গোষ্ঠী অযোগ্য নেতাদের ফতোয়ার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

(ঙ) ফেরেশতাদের অভিশাপ: হাদিসে এসেছে, **"যে ব্যক্তি কোনো মাসয়ালা না জেনে ফতোয়া দেয়, তার ওপর আসমান ও জমিনের ফেরেশতারা লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করেন।"** (দারেমী)।

৪. মুফতি মাজিন বা ধৃষ্ট মুফতির বিধান: হানাফী ফিকহে 'মুফতি মাজিন' (الْمُفْتِي الْمَاجِنُ) বলতে সেই অযোগ্য বা ফাসিক মুফতিকে বোঝায় যে মানুষকে ধোঁকা দেয় বা ভুল ফতোয়া শেখায়। **হুকুম:** ফকীহগণের ঐকমত্যে, শাসকের (রাষ্ট্রের) ওপর ওয়াজিব হলো এমন মুফতিকে **'হাজর' (الحجر) বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা** এবং তাকে ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত রাখা। এমনকি প্রয়োজন হলে তাকে শাস্তি (তাযির) দেওয়া এবং জনসমক্ষে অপমানিত করা, যাতে মানুষ তার থেকে সতর্ক থাকে।

৫. দলিল ও উপমা: ইমাম ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন: *"যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে যেমন সমুদ্রে নামলে ডুবে মরে, তেমনি যে ইলম ছাড়া ফতোয়ার সাগরে নামে সে নিজের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস করে।"*

৬. উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপ হলো, জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এটি কেবল একটি ভুল নয়, বরং এটি খিয়ানত বা আমানতের খেয়ানত। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও অন্যান্য ফিকহী গ্রন্থের শিক্ষা হলো—ফতোয়ার দায়িত্ব কেবল তাদেরই নেওয়া উচিত যারা ইলমের গভীরে পৌঁছেছেন। অযোগ্যদের উচিত আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া, নিজেরা বিচারকের আসনে না বসা। এতেই উম্মাহর কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত।

প্রশ্ন-৬৭: কোনো মাসয়ালায় ফিকহী মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে মুফতি কীভাবে আচরণ করবেন? উত্তরে কি তাঁর জন্য ইমামগণের বিভিন্ন মত উল্লেখ করা আবশ্যক?
(كيف يتعامل المفتي مع الخلاف الفقهي في المسألة؟ وهل يجب عليه ذكر أقوال الأئمة في الجواب؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): ফিকহী মতপার্থক্য বা 'ইখতিলাফ' (الاختلاف) হলো ইসলামী শরীয়তের প্রশস্ততা ও রহমতের প্রতীক। কিন্তু ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এই মতপার্থক্য অনেক সময় সাধারণ মানুষের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। একজন দক্ষ মুফতির দায়িত্ব হলো এই মতপার্থক্যের সাগর থেকে সঠিক ও প্রবল মতটি ছেঁকে এনে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। হানাফী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা 'রাসমুল মুফতি' রয়েছে, যেখানে মুফতি কীভাবে মতভেদ মোকাবিলা করবেন এবং উত্তরে সব মত উল্লেখ করবেন কি না—তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও অন্যান্য ফতোয়া গ্রন্থের আলোকে নিচে এর বিস্তারিত বিধান আলোচনা করা হলো।

২. ফিকহী মতপার্থক্যের ধরণ ও মুফতির দায়িত্ব (أنواع الخلاف ومسؤولية المفتي): মুফতি যখন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হন, তখন তিনি দুই ধরণের মতপার্থক্যের মুখোমুখি হতে পারেন: ১. **মাযহাবের ইমামদের মধ্যকার মতপার্থক্য:** অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মধ্যকার মতভেদ। ২. **বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যকার মতপার্থক্য:** যেমন—হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ভিন্নতা।

হানাফী মুফতির প্রধান দায়িত্ব হলো নিজের মাযহাবের 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া প্রদত্ত হয়) বা 'রাজেহ' (প্রবল) মতটি খুঁজে বের করা। তিনি মনগড়া কোনো মত গ্রহণ করতে পারেন না। **ইমাম ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন: "وَاجِبُ الْمُفْتِي أَنْ يَتَّبِعَ الرَّاجِحَ فِي الْمَذْهَبِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ."** অর্থ: *"মুফতির ওয়াজিব হলো মাযহাবের প্রবল মত অনুসরণ করা। জরুরত বা বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া দুর্বল মতের ওপর আমল বা ফতোয়া দেওয়া জায়েয নয়।"*

৩. মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে মুফতির আচরণের স্তরসমূহ (مراحل تعامل المفتي مع الخلاف): মুফতিকে ক্রমানুসারে নিচের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হবে:

(ক) যাহিরু রিওয়ায়াহ তালাশ করা (البحث عن ظاهر الرواية): সর্বপ্রথম ইমামদের সর্বসম্মত মত তালাশ করতে হবে। যদি ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর দুই প্রধান শিষ্য (সাহেবাইন) একমত হন, তবে সেটাই চূড়ান্ত। **আরবি মূলনীতি: "إِذَا اتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ قَوْلِهِمْ."** (যখন ইমাম আবু

হানিফা ও তাঁর দুই সাথী একমত হন, তখন তাদের মত থেকে সরে যাওয়া যাবে না)।

(খ) ইমামদের মতভেদ থাকলে করণীয়: যদি ইমামদের মধ্যে মতভেদ থাকে, তবে সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে যদি পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (মাশায়েখ) দলিল বা যুগের চাহিদার কারণে সাহেবাইনের কোনো মতকে 'মুফতা বিহি' সাব্যস্ত করেন, তবে মুফতিকে সেই মতই দিতে হবে। **উদাহরণ:** ফসলি জমি বর্গা দেওয়া (মুযারাআহ) ইমাম আবু হানিফার মতে জায়েয নেই, কিন্তু সাহেবাইনের মতে জায়েয। বর্তমানে ফতোয়া সাহেবাইনের মতের ওপর। **আরবি দলিল:** "**الْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ.**"

৪. ফতোয়ার উত্তরে মতভেদ উল্লেখ করার বিধান (حكم ذكر الخلاف في الجواب): মুফতি তার লিখিত বা মৌখিক উত্তরে ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মত উল্লেখ করবেন কি না, তা নির্ভর করে প্রশ্নকারী বা 'মুসতাফতি'-এর অবস্থার ওপর।

(ক) সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে (للعوام): যদি প্রশ্নকারী সাধারণ মানুষ হয়, যে ফিকহের পরিভাষা বোঝে না, তবে তার জন্য উত্তরে **মতভেদ উল্লেখ করা উচিত নয়**। তাকে কেবল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা 'ফতোয়া' জানাতে হবে। **কারণ:** একাধিক মত উল্লেখ করলে সে বিভ্রান্ত হবে এবং নিজের সুবিধামতো একটি বেছে নেওয়ার (তালফিক) সুযোগ খুঁজবে, যা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর। **আরবি নীতি:** "**الْعَامِّيُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ، مَذْهَبُهُ مُفْتِيهِ.**" অর্থ: *"সাধারণ মানুষের নিদির্ষ্ট কোনো মাযহাব নেই (গবেষণার ক্ষেত্রে); মুফতির ফতোয়াই তার মাযহাব।"*

(খ) বিচারক বা আলেমদের ক্ষেত্রে (للقاضي أو العالم): যদি প্রশ্নকারী কোনো বিচারক (কাজী) হন অথবা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি হন যিনি বিষয়টি গবেষণা করতে চান, তবে মুফতির জন্য **মতভেদ উল্লেখ করা উত্তম এবং কখনো আবশ্যক**।

- এক্ষেত্রে মুফতি লিখবেন: "ইমাম আবু হানিফার মতে এমন, তবে সাহেবাইনের মতে এমন। আর ফতোয়া সাহেবাইনের মতের ওপর।"
- এতে বিচারক বুঝতে পারেন যে, তার সামনে অপশন আছে কি না বা মাযহাবের প্রবল মত কোনটি।

(গ) মতভেদ উল্লেখের পদ্ধতি: যদি মতভেদ উল্লেখ করতেই হয়, তবে মুফতিকে অবশ্যই বলে দিতে হবে কোনটি গ্রহণীয়। তিনি এভাবে বলবেন না—"এটিতে দুটি মত আছে"—বরং বলবেন: **"এটিতে মতভেদ আছে, তবে বিশুদ্ধ মত হলো..."** (**وَالْمُخْتَارُ هُوَ... / وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى...**)।

৫. মুফতির সততা ও আমানতদারি: মতভেদ উল্লেখ করার সময় মুফতি নিজের ব্যক্তিগত রুচি বা আবেগকে প্রশ্রয় দেবেন না। যে মতটি দলিলের দিক থেকে শক্তিশালী বা মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সঠিক, তিনি সেটিই প্রচার করবেন। কেউ যদি টাকার বিনিময়ে বা কাউকে খুশি করার জন্য দুর্বল মত (শায কওল) উল্লেখ করে ফতোয়া দেয়, তবে সে 'মুফতি মাজিন' বা পাপাচারী মুফতি হিসেবে গণ্য হবে।

৬. 'আস-সিরাজিয়া'র দৃষ্টিভঙ্গি: 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে দেখা যায়, ইমাম সিরাজুদ্দীন (রহ.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি হুকুম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেখানে মতভেদ খুব শক্তিশালী বা যেখানে মানুষের 'উর্ফ' (প্রথা) ভিন্ন, সেখানে তিনি **"قِيلَ كَذَا وَقِيلَ كَذَا"** (বলা হয়েছে এমন এবং বলা হয়েছে এমন) শব্দে মতভেদ উল্লেখ করেছেন এবং শেষে **"وَالْأَصَحُّ..."** (অধিক বিশুদ্ধ হলো...) বলে সমাধান দিয়েছেন।

৭. উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, মুফতি হলেন দ্বীনের চিকিৎসক। রোগীর সামনে যেমন সব ওষুধের নাম ও রাসায়নিক ফর্মুলা বলা হয় না, কেবল প্রয়োজনীয় ওষুধটি দেওয়া হয়; তেমনি সাধারণ মানুষের সামনে ফিকহী মতপার্থক্য বয়ান না করে চূড়ান্ত সমাধান দেওয়াই হিকমত। তবে জ্ঞানীদের জন্য মতভেদ উল্লেখ করা ইলমের আমানত রক্ষার শামিল। হানাফী ফিকহে এই ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই মুফতিকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন-৬৮: ইমাম সিরাজুদ্দীন-এর ফাতাওয়ার উপর সময় ও স্থানের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। তাঁর পরিবেশ কীভাবে তাঁর গ্রন্থকে প্রভাবিত করেছিল?
(اشرح العامل الزماني والمكاني في تأثير فتاوى الإمام سراج الدين - وكيف أثرت بيئته في كتابه؟)

১. ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং এটি গতিশীল। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে 'জামান' (সময়) এবং 'মাকান' (স্থান)-এর প্রভাব

অনস্বীকার্য। হানাফী মাযহাবের মূলনীতি হলো: **"تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ"** (যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিধানের প্রয়োগ পরিবর্তিত হতে পারে)। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া'র লেখক ইমাম সিরাজুদ্দীন আল-ওশি (রহ.) হিজরি ষষ্ঠ শতকের একজন প্রখ্যাত ফকীহ ছিলেন, যিনি মধ্য এশিয়ার ফারগানা অঞ্চলের 'ওশ' শহরে বসবাস করতেন। তাঁর ফতোয়াগুলোতে তৎকালীন তুর্কি ও অনারব সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়, যা গ্রন্থটিকে ব্যবহারিক ফিকহের এক অনন্য দলিলে পরিণত করেছে।

২. ইমাম সিরাজুদ্দীনের ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট: ইমাম সিরাজুদ্দীন এমন এক যুগে ও স্থানে বসবাস করতেন যেখানে ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল এবং অনারব (আজমী) সংস্কৃতি প্রবল ছিল। তাঁর অঞ্চলটি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল।

- **স্থান (المكان):** ফারগানা বা মাওয়ারাননাহার (Transoxiana)। এটি বর্তমান উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তান অঞ্চল।
- **ভাষা ও সংস্কৃতি:** এখানকার মানুষের ভাষা ছিল ফার্সি ও তুর্কি মিশ্রিত। তাদের লেনদেন, শপথ এবং সামাজিক প্রথা আরবদের থেকে ভিন্ন ছিল।

৩. ফতোয়ার ওপর পরিবেশের প্রভাব (تأثير البيئة على الفتاوى): ইমাম সিরাজুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে এমন অনেক মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন যা তৎকালীন সমাজের 'উর্ফ' বা প্রচলিত প্রথার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া। এর কয়েকটি প্রধান দিক নিচে আলোচনা করা হলো:

(ক) কসম বা শপথের ক্ষেত্রে ভাষার প্রভাব (باب الأيمان): আরব দেশগুলোতে মানুষ আল্লাহর নামে শপথ করত। কিন্তু ইমাম সিরাজুদ্দীনের অঞ্চলের অনারব মানুষ ফার্সি ভাষায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শপথ করত।

- **উদাহরণ:** কেউ যদি ফার্সি ভাষায় বলে, "আমি যদি এ কাজ করি তবে আমি কাফের" অথবা "খোদা জানে" শব্দ ব্যবহার করে।
- **ফতোয়া:** ইমাম সিরাজুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে ফার্সি ভাষায় প্রচলিত শপথের শব্দগুলোর বিধান বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, স্থানীয় ভাষায় কোন শব্দটি শপথ হিসেবে গণ্য হবে আর কোনটি হবে না। এটি স্থানের প্রভাবের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

- **আরবি নীতি: "الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ لَا عَلَى اللُّغَةِ."** অর্থ: *"শপথের বিধান প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভরশীল, শাব্দিক অর্থের ওপর নয়।"*

(খ) লেনদেন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে (باب البيوع): মধ্য এশিয়া ছিল সিল্ক রোডের অংশ। এখানে নতুন নতুন ব্যবসার ধরণ আবিষ্কৃত হয়েছিল।

- **বাইয়ে ওফা (بيع الوفاء):** মানুষ টাকার প্রয়োজনে জমি বিক্রি করত এই শর্তে যে, টাকা ফেরত দিলে জমি ফেরত পাবে। এটি মূল ফিকহে ফাসিদ হলেও, ইমাম সিরাজুদ্দীন ও তাঁর অঞ্চলের ফকীহগণ মানুষের প্রয়োজন বা 'জরুরত' এবং 'উর্ফ'-এর কারণে একে জায়েয বলেছেন।
- **মুযারাআহ (বর্গা চাষ):** এই অঞ্চলে ফলের বাগান ও চাষাবাদ বেশি হতো। তাই বাগান বর্গা দেওয়া বা পানি সেচের বিনিময়ে ফসল ভাগাভাগি করার মাসয়ালাগুলো তিনি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

(গ) বিচার ব্যবস্থা ও দলিল দস্তাবেজ (القضاء والسجلات): তৎকালীন সময়ে মৌখিক সাক্ষীর চেয়ে লিখিত দলিলের প্রচলন বাড়ছিল। ইমাম সিরাজুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে কাজীর জন্য লিখিত রায় এবং দলিলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা পরিবেশের চাহিদার ফল।

(ঘ) ইস্তিহসান ও সহজীকরণ (الاستحسان والتيسير): শীতপ্রধান অঞ্চল হওয়ার কারণে মোজা ও পোশাকের পবিত্রতার মাসয়ালায় তিনি কিছু শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন—মোজা বা কাপড়ে সামান্য নাপাকি লাগলে তা দূর করার সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা সাধারণ মানুষের কষ্টের কারণ দূর করে।

৪. উসুলী মূলনীতি: প্রথার পরিবর্তন (تغير العرف): ইমাম সিরাজুদ্দীন তাঁর ফতোয়ায় প্রমাণ করেছেন যে, মুফতিকে তার সমাজের রীতিনীতি জানতে হবে। যে মুফতি নিজের সমাজের প্রথা জানেন না, তিনি ফকীহ হতে পারেন না।

- **আরবি ইবারত: "الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"** (প্রথা বা রীতি বিচারকের ভূমিকা পালন করে)।
- **"الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا"** (যা সামাজিকভাবে প্রচলিত, তা যেন শর্ত হিসেবেই সাব্যস্ত)।

৫. সমসাময়িক আলেমদের প্রভাব: তিনি কেবল স্থান নয়, বরং তাঁর সমসাময়িক ফকীহদের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। যেমন 'ফাতাওয়া কাজিখান'-এর প্রণেতা ইমাম কাজিখান তাঁর সমসাময়িক ও একই অঞ্চলের ছিলেন। তাদের দুজনের ফতোয়ার ধরণ ও বিষয়বস্তুতে অনেক মিল পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে তারা একই পরিবেশের সমস্যা সমাধান করছিলেন।

৬. উপসংহার (خاتمة): 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' কেবল একটি আইনি বই নয়, বরং এটি ষষ্ঠ হিজরি শতকের মধ্য এশিয়ার সমাজচিত্র। ইমাম সিরাজুদ্দীন প্রমাণ করেছেন যে, ফিকহ মানে কেবল কিতাবের ইবারত মুখস্থ করা নয়, বরং সেই ইবারতকে নিজের সময় ও স্থানের বাস্তবতায় প্রয়োগ করা। তাঁর এই পদ্ধতি পরবর্তীকালের হানাফী ফকীহদের জন্য, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের আলেমদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রশ্ন-৬৯: ভুলবশত হত্যা (ক্বাতলে খাতা) এবং ইচ্ছাকৃতের সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা (ক্বাতলে শিবহে আমদ)-এর বিধান সম্পর্কে আলোচনা কর। দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?

تحدث عن أحكام قتل الخطأ وشبه العمد - وما هو الفرق بينهما في وجوب (الدية والكفارة؟)

---

১. ভূমিকা (مقدمة): মানব জীবনের নিরাপত্তা বিধান ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। হত্যা বা নরহত্যাকে ইসলাম মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা করেছে। তবে সব হত্যার ধরণ ও শাস্তি এক নয়। হানাফী ফিকহে হত্যার প্রকারভেদ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো 'ক্বাতলে খাতা' (ভুলবশত হত্যা) এবং 'ক্বাতলে শিবহে আমদ' (ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্যপূর্ণ)। এই দুটি প্রকারের শাস্তি, বিশেষ করে দিয়াত (রক্তপণ) ও কাফফারার ক্ষেত্রে কিছু মিল ও অমিল রয়েছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' ও হানাফী ফিকহের আলোকে এর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

২. সংজ্ঞা ও পরিচয় (التعريف):

(ক) ক্বাতলে শিবহে আমদ (قتل شبه العمد):

- **সংজ্ঞা:** হত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করেছে যা সাধারণত প্রাণনাশের জন্য ব্যবহার হয় না (যেমন—লাঠি, ছোট পাথর, চাবুক), কিন্তু তাতে ভিকটিমের মৃত্যু হয়েছে।

- **ইমামদের মতভেদ:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ধারালো অস্ত্র ছাড়া যেকোনো কিছু দিয়ে মারলে তা 'শিবহে আমদ'। কিন্তু সাহেবাইনের মতে, যদি ভারী কোনো বস্তু (যেমন বড় পাথর বা মোটা লাঠি) দিয়ে মারে যা দিয়ে মানুষ মরতে পারে, তবে তা 'আমদ' (ইচ্ছাকৃত) হবে, 'শিবহে আমদ' নয়। ফতোয়া সাহেবাইনের মতের ওপর হতে পারে অবস্থাভেদে, তবে হানাফী মাযহাবে আবু হানিফার মতই মূল।

- **আরবি সংজ্ঞা: "أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا كَالسَّوْطِ وَالْعَصَا."**

(খ) ক্বাতলে খাতা (قتل الخطأ):

- **সংজ্ঞা:** যেখানে হত্যার কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না, বরং ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হয়েছে। এটি দুই প্রকার: ১. **কাজের ভুল (خطأ في الفعل):** যেমন শিকারী হরিণকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল, কিন্তু তা গিয়ে কোনো মানুষের গায়ে লাগল। ২. **উদ্দেশ্যের ভুল (خطأ في القصد):** যেমন দূর থেকে কাউকে দেখে শত্রু বা হারবি কাফের মনে করে তীর ছুড়ল, পরে দেখা গেল সে মুসলিম।

- **আরবি সংজ্ঞা: " هُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ حَرْبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ."**

৩. উভয়ের বিধান ও পার্থক্য (الأحكام والفروق):

নিচে দিয়াত ও কাফফারার ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার হত্যার বিধান আলোচনা করা হলো:

বিধানের ক্ষেত্র	ক্বাতলে শিবহে আমদ (Quasi-Intentional)	ক্বাতলে খাতা (Accidental)
১. গুনাহ বা পাপ (الإثم)	এতে কবিরা গুনাহ হয়, কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত	এতে কোনো গুনাহ হয় না, কারণ এটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। আল্লাহ বলেন: *"তোমাদের*

	করেছে। তবে হত্যার গুনাহ (কুফরির কাছাকাছি) হয় না।	*ভুলের জন্য কোনো পাপ নেই।"*
২. কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড (القصاص)	এতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। কারণ এখানে হত্যার পূর্ণ ইচ্ছা (ধারালো অস্ত্র দ্বারা) ছিল না।	এতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। ভুলের কারণে শাস্তি মাফ।
৩. দিয়াত বা রক্তপণ (الدية)	**দিয়াতে মুগাল্লাজাহ (ভারী রক্তপণ):** ১০০টি উট দিতে হবে। এর মধ্যে ৪০টি গর্ভবতী হতে হবে। **আরবি: "تَجِبُ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ."**	**দিয়াতে মুখাফফাফাহ (হালকা রক্তপণ):** ১০০টি উট দিতে হবে, তবে বিভিন্ন বয়সের (গর্ভবতী হওয়ার শর্ত নেই)। অথবা ১০০০ দিনার/১০০০০ দিরহাম।
৪. কে আদায় করবে?	এই দিয়াত হত্যাকারীর আত্মীয়-স্বজন বা গোত্র (**'আকিলা'**) ৩ বছরের মধ্যে আদায় করবে।	এটিও 'আকিলা' বা গোত্রের ওপর ওয়াজিব হবে এবং ৩ বছরে আদায়যোগ্য।
৫. কাফফারা (الكفارة)	হানাফী মাযহাবে শিবহে আমদে **কাফফারা ওয়াজিব**। (গোলাম আযাদ করা বা ৬০টি রোজা রাখা)।	ক্বাতলে খাতায়ও **কাফফারা ওয়াজিব**। আল্লাহ বলেন: *"যে ভুলবশত মুমিনকে হত্যা করে, তার ওপর কাফফারা..."* (নিসা: ৯২)।
৬. উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা	হত্যাকারী নিহতের মিরাস (উত্তরাধিকার) থেকে **বঞ্চিত হবে**।	হত্যাকারী নিহতের মিরাস থেকে **বঞ্চিত হবে**। রাসুল (সা.) বলেছেন: *"হত্যাকারী মিরাস পায় না।"*

৪. বিশেষ বিশ্লেষণ:

- **দিয়াতের ধরণ:** লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, উভয় ক্ষেত্রেই দিয়াত হত্যাকারীর নিজের পকেট থেকে দিতে হয় না, বরং তার সাহায্যকারী গোষ্ঠী বা 'আকিলা'র ওপর বর্তায়। তবে 'শিবহে আমদ'-এ দিয়াত কিছুটা কঠোর (গর্ভবতী উটের শর্ত থাকায়), কারণ এখানে আঘাত করার ইচ্ছা ছিল।

- **কাফফারার হিকমত:** যেহেতু মানুষের প্রাণ নষ্ট হয়েছে, তাই আল্লাহর হক নষ্ট হয়েছে। এই পাপ মোচনের জন্য কাফফারা (টানা দুই মাস রোজা রাখা বা দাস মুক্তি) উভয় প্রকারেই আবশ্যক।

৫. দলিলসমূহ (الأدلة الشرعية):

- **ক্বাতলে খাতা সম্পর্কে:** **"...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً"** (সূরা নিসা: ৯২)।

- **শিবহে আমদ সম্পর্কে:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **" أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ."** অর্থ: *"জেনে রেখো! শিবহে আমদ অর্থাৎ চাবুক ও লাঠির আঘাতে নিহতের দিয়াত হলো ১০০ উট।"* (সুনানে আবু দাউদ)।

৬. উপসংহার (خاتمة): সারসংক্ষেপ হলো, 'ক্বাতলে শিবহে আমদ' এবং 'ক্বাতলে খাতা'—উভয়টিই এমন হত্যা যেখানে কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড নেই, কিন্তু আর্থিক দণ্ড (দিয়াত) এবং ধর্মীয় প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা) রয়েছে। হানাফী ফিকহে এই বিভাজন অপরাধীর নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। যদিও উভয় ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তবুও শরিয়ত ইনসাফের স্বার্থে ইচ্ছাকৃত আঘাত (শিবহে আমদ) এবং অনিচ্ছাকৃত ভুল (খাতা)-এর শাস্তির মাত্রায় তারতম্য করেছে। 'আল-ফাতাওয়া আস-সিরাজিয়া' গ্রন্থে এই বিধানগুলো বিচারকের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে।